বিমল কর
মন্দারগড়ের
রহস্যময়
জ্যোৎস্না

আমার বড়দার নাম শিবনাথ।

নামের সঙ্গে মানুষের স্বভাবের মিল বড় একটা থাকে না। বড়দার বেলায় ছিল। 'ছিল' বলছি এইজন্য যে, বড়দা এখনও বেঁচে আছে কিনা আমরা জানি না। জানলে হয়তো মনটাকে সইয়ে নেওয়া যেত।

দু' বছর আগে একদিন বড়দা হঠাৎ আমাদের লয়লাপুরের বাড়ি থেকে চলে যায়। কাউকে কিছু না জানিয়ে। নিরুদ্দেশ বলতে যা বোঝায় সেইরকম আর কী! অন্তর্ধানও বলা যায়।

মেজদা আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে খবরটা জানাতে ভোলেনি। চিঠি পেতেই যা দু-তিনদিন দেরি হয়েছিল। তবে মেজদা লিখেছিল: "বড়দার কাণ্ডকারখানা তো তুই জানিস, এ তো নতুন নয়; দশ-পনেরোদিন পর আবার ফিরে আসবে বলে মনে হয় দাদা। তবু আমি জানাশোনা জায়গায় খবর নিচ্ছি। তুই ভাবিস না।"

বড়দার জন্য প্রথম দু-এক হপ্তা আমরা অতটা ভয়-ভাবনা করিনি। কেননা, আমাদের বড়দা আগেও দু'-চারবার এরকম কাণ্ড করেছে। হঠাৎ উধাও, আবার দশ-বিশদিনের মধ্যে বাড়িতে ফিরে আসা।

এবার কিন্তু তা হল না। দু-এক হপ্তা থেকে দু-এক মাস, তারপর চার-ছ' মাস। শেষে বছর। বছর গড়িয়ে আবার বছর। দু' বছরেও বড়দার কোনও খবর পাওয়া যায়নি। আমরা সবরকম চেষ্টা করেও খোঁজ পেলাম না দাদার।

একেবারে হালে, বড়দার অন্তর্ধানের ঠিক ছাব্বিশ মাস পরে আমার নামে একটা রেজিস্ট্রি-করা প্যাকেট এল। খুলে দেখি, একটা সাধারণ চটিমতন ডায়েরি-খাতা আর একটি চিঠি।

চিঠিটি লিখেছেন মুকুলমনোহর ত্রিবেদী বলে এক ভদ্রলোক। চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে, তাঁদের ওদিককার এক ধর্মশালার পাঁড়েজি এই খাতাটা তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন। খাতায় যা-যা লেখা আছে তার বারোআনাই তিনি বোঝেননি। তাঁর কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। যাই হোক, ডায়েরি খাতার একপাশে আমার নাম-ঠিকানা দেখতে পেয়ে তিনি খাতাটা আমায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এই খাতার মালিক কি লেখক যে কে—তা উনি আন্দাজ করতে পারছেন না, তাঁকে কখনও দেখেছেন কিনা তাও বলতে পারবেন না। নিজে তিনি বাস সার্ভিসের ডিপো ম্যানেজার। কত লোক আসে-যায় রোজ, কত লোককেই তো তিনি দেখেন। তার মধ্যে কে যে এই ডায়েরির মালিক, কে জানে! আরও অবাক কথা, ডায়েরি খাতায় নিজের নামের একটা ছোট সই থাকলেও পুরো নাম আর বাড়ির ঠিকানা লেখা নেই। নাম-ঠিকানা যা পাওয়া গেছে তা শেষের দিকের পাতার এককোণে, পেনসিলে লেখা। ওটা খাতার মালিকের হতে পারত—যদি ডায়েরির গোড়ার পাতায় ছোট করে লেখা সই আর শেষের দিকের লেখা নামের আদ্যক্ষর এক হত। দুটোই আলাদা। কাজেই তিনি যে নাম-ঠিকানা পেয়েছেন তার ওপর ভরসা করেই খাতাটা পাঠাচ্ছেন।

ত্রিবেদীজির অনুমান ঠিকই। বড়দার নাম শিবনাথ

গুহমজুমদার। আমার নাম কৃপানাথ। মেজদার নাম বিশ্বনাথ। বড়দার সই ছিল এস. জি. এম. বলে। 'এস' অক্ষর আর 'কে' অক্ষরে অনেক তফাত।

ডায়েরি খাতাটা পেয়ে আমি যত অবাক, ভেতরের এলোমেলো আধখাপচা টুকরোটাকরা লেখা পড়ে তার চেয়েও বেশি হতভম্ব, বিহ্বল। ভয় ধরে গেল।

বড়দা কি তবে সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে গিয়েছিল? মাথার গোলমাল হয়েছিল দাদার? নয়তো এসব কী লিখেছে?

আমার বড়দার কথা এখানে একটু বলতে হয়। না বললে বুঝতে ভুল হতে পারে।

আমাদের বড়দা ছিল সরল সাদাসিধে মানুষ। একেবারে যেন ভোলানাথ। আত্মভোলা তো বটেই, বেশ খামখেয়ালিও। বড়দাকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে, মানুষটা একসময় এঞ্জিনিয়ারিংও পাস করেছিল। বাবার মনে যাই থাকুক, বড়দাকে কখনও চাকরিবাকরি করাতে পারেননি। আমাদের মা নেই। কবেই চলে গিয়েছেন। বাবাও চলে গেলেন একদিন। বড়দাই থাকল মাথার ওপর। লয়লাপুরের যে-জায়গাটায় আমরা থাকতাম তার নাম ছিল রোসলপুর। ঘরবাড়ি, সামান্য জমিজায়গা, ফলমূলের ছোটখাটো বাগান আমাদের ছিল। বড়দা রোসলপুরের বাজারে একটা মনিহারি দোকান দিয়ে বসে থাকল। দোকানে সাধারণ ওষুধপত্রও পাওয়া যেত। ওই দোকান আর বাড়ি নিয়েই দিন কেটে যেত দাদার। নিজে বিয়ে-থা করেনি। মেজদার বিয়ে-থা দিয়ে তাকে সংসারী করে বসিয়ে দিয়েছিল দাদা। মেজদা ডাক্তার। প্যাথোলজিস্ট। কাছাকাছি এক ছোট হাসপাতালে চাকরি করে। বড়দা, মেজদা বাড়িতে। আমিই শুধু বাইরে। কলকাতায় থাকি। চাকরি করি ওষুধ কোম্পানিতে।

ঘুরে বেড়াবার কাজই বেশি।

বড়দার সম্বন্ধে আরও দু-একটা কথা বলা দরকার। আমি বরাবরই দেখেছি, ভুতুড়ে, অলৌকিক, অদ্ভুত ব্যাপার-ট্যাপার সম্পর্কে দাদার খুব ঝোঁক। মানে, এইসব বিচিত্র ঘটনার ওপর ওর ভীষণ টান ছিল। বাড়িতে বড়দার ঘরে হরেকরকম বই, কাগজপত্র, খবরের কাগজের কাটিং, ধুলোভরা উইয়ে-কাটা পুঁথিপত্রের মতন ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো বই যে কত—তার হিসেব কে করবে! দু-একটা বইয়ের নাম আমার মনে পড়ছে। যেমন, 'এ স্টেপ ইন দ্য ডার্ক', 'দ্য সিক্সথ সেন্স', 'আওয়ার হ্যন্টেড প্ল্যানেট'। নামগুলো মনে পড়ছে—কেননা আমি দু-চারবার এইসব বই নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করেছি। একবর্ণও বুঝিনি। বইগুলো সবই বিদেশি; বিখ্যাত প্রকাশকদের ছাপা। কেউ যদি লেখক-প্রকাশকের নাম-ঠিকানা জানতে চায়—জানিয়ে দিতে পারি।

বড়দার কাছে এই বইগুলো যেন তার প্রাণ। মেজদা বলে, দাদার যত পাগলামি! যত্ত ভূত আর অদ্ভুত নিয়ে মাথা ঘামানো!

পাগলামি কিনা আমি জানি না। জগতে কতরকম কী ঘটে, আমরা তার এককণাও জানি কী! না জেনে কোনও কথা কেমন করে উড়িয়ে দেওয়া যায়!

তবে হ্যাঁ, বড়দার মধ্যে যে একটু-আধটু পাগলামি আছে—তা আমিও জানি। মানুষটা দোকান, বাড়ি, মেজদার ছেলেকে নিয়ে দিব্যি আছে। হঠাৎ একসময় উধাও। বাড়িতে বউদিকেও কিছু বলে যায় না। সাতদিন, দশদিন, বড়জোর পনেরোদিন—তারপর আবার ফিরে আসে। বড়দা না থাকলে দোকান সামলায় কচিদা, যার ভাল নাম কাঞ্চন। কর্মচারীও আছে—একটা ছেলে, লাটুয়া।

বড়দার বয়েসের কথাটাও বলতে হয়। তা প্রায় পঞ্চাশ হল। পাকা শরীর-স্বাস্থ্য, মাথায় লম্বা, গায়ের রং ফরসা। মুখে দাড়িগোঁফ। মোটা খদ্দর ছাড়া অন্য কিছু পরে না। একেবারে ষোলোআনা নিরামিশাষী। দুধ খেতে খুব ভালবাসে। আর জিলিপি। পঁচিশ-তিরিশটা গরম 'জিলাবি' বড়দা দশ মিনিটে শেষ করে দিতে পারে।

আমার এই বড়দার হঠাৎ অন্তর্ধান, দু' বছর একেবারে নিখোঁজ, তারপর একদিন আচমকা তার একটা ডায়েরি—যা কিনা এলোমেলো অস্পষ্ট কিছু লেখা বই কিছু নয়—আমার ঠিকানায় এসে পৌঁছনো নিয়েই এই কাহিনী।

বড়দার ডায়েরি পড়ে আমি একেবারে হতভম্ব। আমার মাথায় কিছু ঢুকছিল না।

পাতা উলটে-উলটে বার কয়েক লেখাগুলো পড়লাম। বুঝতে পারলাম না। খাপছাড়া বিক্ষিপ্ত কিছু 'নোট্স'।

যেটুকু বুঝলাম তা থেকে মনে হল : মন্দারগড় বলে একটা জায়গায় এমন এক আলো দেখা যায়—মাঝে-মাঝে—যা একেবারে জ্যোৎস্নার মতন। কৃষ্ণপক্ষেও দেখা যায়। শুক্লপক্ষেও। শুক্লপক্ষে চাঁদের আলো দেখা যাবে এটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু শুক্লপক্ষের সব দিন তো ত্রয়োদশী, চতুর্দশী বা পূর্ণিমা নয় যে, সন্ধে না ঘনাতেই জ্যোৎস্না এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বিশ্বচরাচর।

বড়দা যে জ্যোৎস্না বা আলোর কথা লিখেছে তা কিন্তু পক্ষ মানে না, তিথি মানে না; নিজের মরজি মতন সে দেখা দেয়—আবার মিলিয়েও যায়।

ব্যাপারটা বিচিত্র বইকী !

দুটো দিন ওই ডায়েরি নিয়ে আমার কাটল। মেজদাকে একটা জরুরি চিঠি লিখে দিলাম যে, আমি দু-একদিনের মধ্যে বাড়িতে আসছি। বড়দার খোঁজ পাওয়া যায়নি, তবে আচমকা তার লেখা একটা ডায়েরি এসে পড়েছে হাতে। বাড়িতে গিয়ে কথা হবে।

বাড়ি যাওয়ার আগের দিন আমার বন্ধু আনন্দকে তার বাড়িতে গিয়ে ধরলাম।

আনন্দ বলল, "আয়। তোকে ক'দিন দেখতে পাচ্ছি না।"

"ঝামেলায় ছিলাম। শোন, তোর সঙ্গে কথা আছে।"

"বোস। চা খা। বলে আসি।"

আনন্দ বাড়ির ভেতরে গেল। ফিরে এল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে।

"তোর কী মনে হচ্ছে রে, কৃপা? বৃষ্টি আরও চলবে, না, বন্ধ হল?" আনন্দ বলল।

"চলবে।" আমি বললাম।

"এখনও চলবে! বলিস কী! এবারে তো ভাসিয়ে দিল!"

"তা দিক। আশ্বিন মাসে বৃষ্টি বিদায় নেয় না। আরও একটা মাস ধরে রাখ।"

"অ্যানাদার মান্থ! উঃ!"

"বৃষ্টির কথা রাখ। তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।"

"বল?"

"মন্দারগড় বলে কোনও জায়গার নাম শুনেছিস?"

"মন্দারগড়— ! মন্দার—গড়! কই, না। কেন?"

"তুই তো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াস। ঘুরে বেড়ানো তোর নেশা। স্বভাব। তাই জিজ্ঞেস করছি।"

আনন্দ মাথা নাড়ল। তবু ভাবছিল। বলল, "না ভাই; ওরকম নাম শুনিনি। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে গড়

মান্দারণের কথা পড়েছি। সেটা তো শুনি পুরনো বিষ্ণুপুর জাহানাবাদ—ওসব এরিয়ার কোথাও একটা গড়টড় ছিল! বলতে পারছি না। বানানো নামও হতে পারে। কেন?"

"না-না, সে গড় নয়। এ একেবারে অন্য।"

"কোথায়?"

"সেটাই তো তোকে জিজ্ঞেস করছি।"

"বলতে পারব না।"

"উড়িষ্যা, এম-পি আর বিহারের বর্ডারের গায়ে বলে আমার মনে হচ্ছে।"

"কে বলল?"

"ডায়েরির নোট পড়ে তাই মনে হচ্ছে।"

"ডায়েরি! কার ডায়েরি?"

"বড়দার।"

আনন্দ ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। আমার বড়দা যে আজ দু' বছর ধরে নিরুদ্দেশ—এ-কথা সে জানে। ভাল করেই জানে। তার সঙ্গে বড়দার ব্যাপার নিয়ে আমার কত কথাই হয়েছে কতবার। নতুন করে বলার কিছু ছিল না, শুধু এই দিন-দুই আগে যা ঘটেছে সেটা ছাড়া।

আনন্দ অবাক গলায় বলল, "তোর বড়দার ডায়েরি! কই, আগে তো শুনিনি!"

"কেমন করে শুনবি! আমি নিজে কি জানতাম! গত বুধবার হঠাৎ এক রেজিস্ট্রি প্যাকেট এল আমার নামে। এক ভদ্রলোক পাঠিয়েছেন। খুলে দেখি তার মধ্যে বড়দার একটা পাতলা ডায়েরি খাতা। তাতে কিছু এলোমেলো লেখা। নোট্স গোছের।"

"কে পাঠিয়েছেন? ভদ্রলোকের নামধাম...?"

"ভদ্রলোকের নাম মুকুলমনোহর ত্রিবেদী।"

"দারুণ নাম তো! মুকুলমনোহর!...তা কোথা থেকে পাঠিয়েছেন?"

"মধ্যপ্রদেশের কাটোরাঘাট বলে একটা জায়গা থেকে।"

"কোথায় জায়গাটা?"

"বলছি। আগে ডায়েরির কথাটা শোন।"

আমি যতটা পারি সংক্ষেপ করে আনন্দকে ডায়েরি পাওয়া এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত বলছিলাম, এমন সময় চা এল।

চা রেখে বাড়ির কাজের ছেলেটি চলে যাওয়ার পর চা খেতে-খেতে কথাগুলো সেরে ফেললাম।

আনন্দ খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনছিল। মাঝে-মাঝে দু-একটা প্রশ্ন করছিল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল—আমার কথা সে যতটা অবাক হয়ে শুনছে, ততটা বিশ্বাস করতে পারছে না। বরং তার যেন অবিশ্বাসই বেশি।

আমি থামলাম।

আনন্দ বলল, "ডায়েরি খাতাটা এনেছিস?"

"না। আমার কাছেই আছে। বাড়িতে।"

"আনলে পারতিস। পড়ে দেখতাম। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। সারা বছর একটা জায়গায় কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ সবসময় জ্যোৎস্নার আলোর মতন আলো দেখা যাবে—এ কেমন করে হয়!"

"রোজই দেখা যায়, তা অবশ্য নয়। মাঝে-মাঝে যায় না। আবার দেখা যায়।"

"বড়দা কী লিখেছেন বল দিকি?"

"বড়দার ডায়েরি থেকে আমার মনে হল, এইরকম আলো নাকি আগে আরও দু'বার দেখা গিয়েছিল। একবার সেই উনিশশো

চল্লিশ সালের আগে। তারপর উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে। আর এখন আবার দেখা যাচ্ছে।"

"একই জায়গায় দেখা যাচ্ছে?"

"মোটামুটি জায়গাটা এক। এক-আধ মাইল তফাত হচ্ছে।"

"বড়দা কি এই আলো দেখতেই ওখানে—মানে—কী গড় বললি—সেখানে গিয়েছিলেন?"

"মন্দারগড়! আমার মনে হয় বড়দা কোনও সূত্রে খবরটা শুনে ওখানে গিয়েছিল। দেখতে।"

"দু' বছর ধরে তিনি ওখানে বসে-বসে আলো দেখেছেন? তাই হয় নাকি?"

"কী জানি! ডায়েরিতে কোথাও তারিখ নেই যে বুঝব, কবে গিয়েছিল, কতদিন ছিল বড়দা!...আরও একটা-দুটো অদ্ভুত জিনিস লেখা আছে মন্দারগড় নিয়ে। লেখা আছে, ওই আলো যখন দেখা দেয় তখন চারপাশ থেকে ঝিঁঝির ডাকের মতন এক শব্দ শোনা যায়। সে নাকি এমন শব্দ যে, খানিকক্ষণ পরে ঝিম ধরে যায় মাথায়। আর আলোর মধ্যে গড়ের মাথার ওপর একটা অদ্ভুত জিনিস—দেখতে অনেকটা সাবমেরিনের মতন—ছোট্ট 'ভেসেল' ঘুরে বেড়ায়।"

"আন্‌আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট নাকি? যাকে বলে ইউ-এফ-ও?"

"কী জানি!...আরও দু-চারটে অবাক ব্যাপার আছে। ডায়েরি পড়লে বুঝতে পারবি।"

"তা তুই কী করবি?"

"আমি একবার বাড়ি যাব দু-একদিনের মধ্যে। মেজদার সঙ্গে কথা বলব। ফিরে আসব আবার। তারপর খোঁজখবর করে মন্দারগড়ে যাব।...তুইও যাবি আমার সঙ্গে। পারবি না? তোর

অফিস থেকে ছুটি ম্যানেজ করতে পারবি না দিন আট-দশ ?"

আনন্দ হাসল। "পুজোর মুখে ছুটি ম্যানেজ করা মুশকিল। তবু যাব। তুই ভাবিস না।"

মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন ধরলে মোটামুটি একটা রাত কাটাতে পারলেই আমাদের লয়লাপুরে পৌঁছনো যায়। শনিবার সন্ধের মুখে হাওড়া স্টেশন এসে গাড়ি ধরলাম।

ট্রেনে এক চেনাজানা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি কলকাতার লোক। নিজের ছোটখাটো ব্যবসা রয়েছে। রাবার কারখানা।

ভদ্রলোক ব্যবসার কাজে কোথাও যাচ্ছিলেন। বললেন, "কোথায় ?"

"বাড়ি যাব।"

"সে কী! এত তাড়াতাড়ি! পুজোর তো এখনও দেরি, মশাই।" বলে হাসলেন।

আমি হেসে বললাম, "না, দরকার আছে।"

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথায়-কথায় খানিকটা সময় কাটানো গেল। ভালই হল। আসলে আমার মনে ক'দিন ধরেই নানান দুর্ভাবনা। দিনে, রাতে কোনও সময়েই সুস্থির হতে পারছি না। কতরকম কী ভাবছি! কখনও বড়দার কথা, কখনও মন্দারগড়ের কথা, সেই জ্যোৎস্নার কথা, এমনকী বিচিত্র সেই বায়ুযানটির কথা— যেটি গড়ের মাথার ওপর মাঝে-মাঝে ভেসে বেড়ায়

জ্যোৎস্নার মধ্যে। এইরকম আরও কত কী মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনবরত।

তবে সবচেয়ে বেশি ভাবছিলাম বড়দাকে নিয়ে। বড়দা যে কবে মন্দারগড়ে গিয়েছিল তা কোথাও লেখা নেই। মানে একটা তারিখও লেখা নেই ডায়েরির কোথাও। থাকার মধ্যে গরমকালের কথা লেখা আছে দু-এক জায়গায়। সেটা কোন গরমকাল? এ-বছরের? না, গত বছরের? এ-বছরের গরমকাল হলে, দাদার খোঁজখবর পাওয়ার খানিকটা আশা করা যায়। তার আগে হলে ভরসা করে লাভ কী! বড়দা যে বেঁচে আছে তাও তো আর মনে হয় না!

কোথায় গেল মানুষটা? আর কেমন করেই বা গেল?

এইসব ভাবতে-ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কে জানে! ভোরে ঘুম ভাঙল যখন— তখন চেনাশোনা ভদ্রলোককে আর দেখতে পেলাম না। তিনি অনেক আগেই নেমে গিয়েছেন।

বাড়িতে সন্ধেবেলায় মেজদা, বউদি আর আমি— তিনজনে বসে দাদার ডায়েরি নিয়েই কথাবার্তা বলছিলাম।

মেজদা বলল, "তারিখ-টারিখ, সময় কিছুই নেই, কেমন করে বুঝব লেখাগুলো কবেকার!"

আমি বললাম, "গরমকালের কথা আছে!"

"কোন গরম? এ-বছর, না, গত বছর? না, তার আগের বছর?"

বউদি বলল, "এ তো সোজা হিসেব। গত বছর বা এ-বছর। দাদা গত বছরের আগের বছর শ্রাবণ মাসে চলে গিয়েছিলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে। রাখী পূর্ণিমার আগের দিন।"

"মানে, এইট্টি নাইন-এ... ! ইংরিজি কী মাস ?"

"জুলাই হবে," মেজদা বলল।

"এইট্টি নাইন জুলাই থেকে নাইনটি জুলাই, এক বছর। নাইন্‌টি জুলাই থেকে নাইনটি ওয়ান জুলাই দু' বছর। এখন নাইন্‌টি ওয়ান সেপ্টেম্বর। ওই ছাব্বিশ মাসই হল।"

মেজদা বলল, "এইট্টি নাইন বাদ। জুলাই মাসে চলে গিয়েছে দাদা। তখন বর্ষাকাল। কাজেই ওই বছরের গরমের কথা ওঠে না। গত বছর হতে পারে, বা এ-বছর।"

বউদি বলল, "ডায়েরিটা কিন্তু পুরনো। উননব্বই সালের।"

ঠিকই বলেছে বউদি। ডায়েরিটা পুরনো। বাহারি বড়সড় ডায়েরি খাতা নয়, একেবারে মামুলি খাতা। কোনও এক অগ্রওয়াল কোম্পানির। উননব্বই সালেরই। বড়দাকে কেউ দিয়েছিল। এরকম ডায়েরি খাতা বড়দার ঘরে আরও আছে। পুরনো খাতা পড়ে রয়েছে। ডায়েরি লেখার অভ্যেস বড়দার ছিল না। ক'জনারই বা থাকে ! আমরা কে আর না নতুন বছরে এক-আধটা ডায়েরি খাতা না পাই। কিন্তু পাই বলেই যে ডায়েরি লিখি, তা তো নয়। বড়দাও নিয়মিত কিছু লিখত বলে জানি না। তবে হ্যাঁ, অনেক ডায়েরির পাতায় দু-একটা টুকরো লেখা যেমন লেখা থাকত— তেমনই হিসেবপত্রও থাকত কিছু-কিছু। বড়দা লিখত। দোকানের হিসেব, এখনও বা বাড়িতে মিস্ত্রি-মজুর খাটলে তার হিসেব। আবার ডায়েরি বইয়ের পাতা ছিঁড়ে টুকটাক ফর্দ বা চিঠিও লিখত বড়দা। মেয়েরা তো এমন ডায়েরিতে মুদি, ধোপা, দুধের হিসেবও লেখে।

বউদির কথা মেনে নিয়ে আমি বললাম, "গত বছর গরম বা এ-বছরের গরম যে, তা ঠিকই। তবে কোন বছর ? গত বছর হলে, বড়দার খোঁজখবর আর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

পনেরো-ষোলো মাস হয়ে গেল। এ-বছর হলে একটা আশা আছে। মানে, তবু একটু আশা করতে পারি।"

মেজদা চুপ করে থাকল। তারপর বড় করে নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি কী বলব! আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। গড়, জ্যোৎস্না, একটা নৌকো না কী ভেসে বেড়ায় বলছিস— কেমন করে এসব সম্ভব! গল্পটল্প হলে না-হয় বুঝতাম বানানো ব্যাপার। কিন্তু দাদা তো গল্প লেখার লোক নয়।"

আমি বললাম, "আরও দু-চারটে ব্যাপার আছে।"

"কী?"

"মন দিয়ে পড়োনি লেখাগুলো?"

"পড়েছি। এমন ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল যে, সব মনে রাখতে পারিনি।"

"গড়ের আশেপাশে এক-আধটা ছোট গ্রাম ছিল আগে। এখন আর নেই। গ্রামের লোকরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে গ্রাম ছেড়ে।"

"পড়েছি। কেন পালিয়েছে, মনে পড়ছে না এখন!"

"গ্রামের দু-তিনজন লোক হাওয়া হয়ে গিয়েছে অদ্ভুতভাবে। তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।"

"কেমন করে গেল!... ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে! দাদা লিখেছে, গ্রামের লোক বলে— হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠে লোকগুলোকে কোথাও টেনে নিয়ে গিয়েছে। উড়িয়ে ফেলে দিয়েছে কোন খানাখন্দে। কিংবা তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে নৌকোয়।"

"তাদের তাই ধারণা। সত্যি-মিথ্যে বলা মুশকিল।... আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার দাদা লিখেছে। লিখেছে, গড়ের আশেপাশের অনেক গাছপালা যেন বাজ পড়ে ঝলসে শুকনো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডালপালা শুকনো, মরা, একটা পাতাও আর চোখে পড়ে না। গাছের কঙ্কাল যেন!"

বউদি বলল, "সবই ভুতুড়ে ব্যাপার !"

মেজদা বলল, "তুই এখন কী করবি ঠিক করছিস ?"

"আমি একবার মন্দারগড় যাব ।"

"তুই ? একলা ?"

"একলা নয় । আমার এক বন্ধুও সঙ্গে যাবে ।"

"আমিও যেতে পারি ।"

"না । তোমার গিয়ে লাভ নেই । তুমি বাড়িতে থাকো । আমি ওখানে গিয়ে তোমাদের চিঠি লিখে সব জানাব । নিজের চোখে না দেখলে আমার কিছুই বিশ্বাস হচ্ছে না ।"

"দেখতে গিয়ে বিপদে পড়লে কী করবি ? দাদাও তো দেখতে গিয়েছিল বলে মনে হচ্ছে ।... কৃপা, তোকে সত্যি কথা বলছি । দাদা আজ দু' বছরের বেশি নেই । তবু আমার মনে হত, দাদা কোথাও আছে হয়তো । খেয়ালি মানুষ । হয়তো সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে বসে আছে কোথাও । এই ডায়েরি পড়ে আমার মনে হচ্ছে, দাদা আর হয়তো নেই ।" বলতে-বলতে মেজদা কেঁদে ফেলল ।

বউদির চোখেও জল । দাদা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আমাদের সবেধন ভাইপোটিকে নিয়ে বিস্তর ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হয়েছে বউদি আর মেজদাকে । তাকে সামলানো যেত না । অসুখ-বিসুখও করেছে । পরে ক্রমে-ক্রমে তাকে সামলানো গিয়েছে । ছেলেটাকে মিথ্যে করে কত কী বলা হয়েছে । মেজদা, বউদির ভয় আমি বুঝতে পারি ।

আমি বললাম, "মেজদা, আমি বড়দার মতন বোকামি করব না । বড়দা যেচে যদি বিপদে পড়ে থাকে— তবে সেটা তার বোকামি । আমি বিপদের বাইরে থাকব । সঙ্গে আমার বন্ধু থাকবে ।... তা ছাড়া, কথা কী জানো ? বড়দার একটা খোঁজ পাওয়া দরকার । সে আছে কি নেই— সেটা আলাদা ব্যাপার ।

কিন্তু মানুষটা গেল কোথায় ? কী হয়েছিল তার ? গড়ের জ্যোৎস্না আমার কাছে বড় কথা নয়। আমার কাছে, নিজের দাদার কী হল জানাটাই আসল কথা। তোমরা আপত্তি করো না। প্লিজ।"

মেজদা ফোঁপাতে লাগল।

বউদি আর বসল না। বসতে পারছিল না। মুখ লুকিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বছরে দু-তিনবার আমি বাড়িতে আসি বরাবরই। কখনও-কখনও ফাঁকফোকর পেলে বাড়তি এক-আধবারও হয়ে যায়। পুজোর সময় তো বরাবরই আসি। আর শীতের শেষে, মোটামুটি দোলের সময়। আমাদের এখানে ওই সময়টা বড় চমৎকার।

যখনই বাড়িতে আসি, বড়দার ঘরে মাঝেসাঝে উঁকি দেওয়া আমার স্বভাব। বিশেষ কোনও কারণে নয়, এমনি। খানিকটা সাধারণ কৌতূহল। বড়দার ঘরে নতুন কী জমল, দেখার আগ্রহ হয় হয়তো।

বড়দা আজ দু' বছর নিরুদ্দেশ। এই দু' বছরে আমি পাঁচ-সাতবার বাড়ি এসেছি। বড়দার ঘরও দেখেছি বই কী! ভেবেছি, যদি একটা এমন কিছু পাওয়া যায়— কোনও সূত্র— যা থেকে অন্তত দাদার হঠাৎ নিরুদ্দেশের কারণটা জানা যায়, তা হলে মনে হয়তো স্বস্তি পাব।

ঘরের জিনিসপত্র ঘেঁটেছি। কাগজপত্র উলটেছি, আলমারি খুলে দেখেছি ইতিউতি— কিছুই খুঁজে পাইনি।

এবারও বড়দার ঘরে আমার একটা বেলা কেটে গেল।

অন্যবারের তুলনায় এবারে খোঁজাখুঁজি বেশি করলাম। আগে তো জানতাম না কিছুই, আন্দাজও করতে পারিনি— কাজেই যা

খুঁজেছি সবই ওপর-ওপর। এবার তো তা নয়।

মেজদা বলল, "পেলি কিছু?"

"না।"

"তা হলে?"

"আমি ভাবছি, বড়দা কি কোথাও মন্দারগড়ের কথা পড়েছিল? কিংবা শুনেছিল? আর তখনই মাথায় খেয়াল চাপল মন্দারগড় যাওয়ার? পুরনো কাগজপত্র যা পড়ে আছে, দেখলাম। মন্দারগড়ের কথা কোথাও নেই।"

মেজদা বলল, "না-না, মন্দারগড় তখন কোথায়। দাদা তো জুলাই মাস নাগাদ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। গড়ের ভূত মাথায় চাপলে— তখন-তখনই সেখানে ছুটত। কিন্তু ডায়েরির লেখা থেকে যা মনে হল, বাড়ি ছাড়ার পরের বছর গরমকালে দাদা মন্দারগড়ে গিয়েছিল। বা এ-বছর। ...না না, বাড়ি ছাড়ার সময় দাদার মাথায় মন্দারগড় ছিল না।"

"আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে যাবেই বা কেন?"

"ও তো বড়দার স্বভাব।"

"এখানে বড়দার বিশেষ বন্ধু হরিদা। ভাবছি আজ একবার হরিদার কাছে যাব।"

"আগেও গিয়েছিলি তুই। আমি গোড়া থেকে কতবার জিজ্ঞেস করেছি— হরিদা কিছু জানেন কি না! দাদা তাঁকে কোনও কথা বলেছিল কিনা! হরিদা বলেন, দাদা একটা কথাও তাঁকে বলেনি।"

"এবারের ব্যাপারটা অন্যরকম, মেজদা। একটা খোঁজ তো আমরা পেয়েছি। হরিদাকে জানানো দরকার। আর কথায়-কথায় যদি কিছু মনে পড়ে যায় হরিদার— বলতে পারবেন।"

"তা অবশ্য ঠিক।"

সামান্য চুপ করে থেকে আমি বললাম, "বড়দার ঘর থেকে দু-একটা বই আমি নিয়ে যাব।"

"বই ?"

"পড়ে দেখব। কী আছে ওই বইগুলোয়— ওই ইউ-এফ-ও ব্যাপারটা কী, একটু পড়ে না দেখলে বুঝতে পারছি না দাদা কী বলতে চেয়েছে ডায়েরিতে।"

"বেশ তো, নিয়ে যা। তা ছাড়া দাদা চলে যাওয়ার পর থেকে তার বইপত্রে শুধু ধুলো জমছে। আমি ওসব বুঝি না। আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।"

হরিদা থাকেন কোতোয়ালির কাছে।

সন্ধেবেলায় হরিদার কাছে গেলাম। বাড়িতেই ছিলেন হরিদা। উনি এখানকার স্কুলের অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার।

"আরে কৃপা যে! কবে এলি তুই ?" হরিদা আমায় হাত বাড়িয়ে ডেকে নিলেন।

"কাল এসেছি।"

"পুজোর আগে এলি যে বড় ? পুজোয় আসবি না ?"

"বলতে পারছি না, দাদা। আমি একটা জরুরি কাজে এসেছি।"

"জরুরি কাজে— !"

"আপনার সঙ্গে ক'টা কথা আছে।"

"ভেতরে চল।"

বাবার ঘরে বসলাম দু'জনে।

"কী কথা, বল ?"

বড়দার ডায়েরির কথা বললাম হরিদাকে। অবাক হয়ে

শুনলেন হরিদা। মাঝে-মাঝে কথাও বলছিলেন।

আমার কথা শেষ হওয়ার পর, হরিদা মাথা নাড়তে লাগলেন।

আমি তাঁকে দেখছিলাম।

মাথা নাড়তে-নাড়তে হরিদা বললেন, "শিবু আমায় গড়ের কথা একবারও বলেনি। তবে— তবে একদিন কথায়-কথায় বলেছিল, কোথায় যেন একটা পাহাড়ি ছোট নদীর ওপর কাঠের তক্তা পাতা সাঁকোর কাছে নৌকোর মতন একটা জিনিস শূন্যে ভেসে বেড়াতে দেখেছে লোকে। জায়গার নামটাম তো আমার মনে নেই, কৃপা। আমি ভাল করে শুনিওনি সব। তবে জায়গাটা কাছাকাছি নয়। শিবু যা পাগল, হঠাৎ সেই নদী খুঁজতে চলে গিয়েছিল কিনা কে জানে!"

"জায়গাটা কোন দিকে, মানে কোন স্টেটে হতে পারে বলে আপনার মনে পড়ে?"

"না।"

"এম পি— মধ্যপ্রদেশ?"

"বলতে পারছি না। হতে পারে। আমাদের এদিকে কোথাও নয়।"

"দাদা আর কিছু বলেছিল?"

"না।"

"সেখানে যাবে বলেছিল?"

"কই, না! তাও তো বলেনি।"

আমি সামান্য চুপচাপ বসে থেকে বললাম, "হরিদা, আমি একবার মন্দারগড়ে যাচ্ছি। দেখি, যদি কোনও খোঁজ পাই!"

হরিদা আমায় দেখছিলেন।

কলকাতায় ফিরে এসে দেখি আনন্দ মোটামুটি সব ব্যবস্থা সেরে রেখেছে। তার অফিস নিয়ে একটু ভাবনা ছিল, ছুটি পায় কি পায় না! পুজোর মুখে মুখে ছুটি বলেই ঝামেলা। তা আনন্দ চালাক-চতুর ছেলে, তার খানিকটা খাতিরও আছে অফিসে। বছর দুই আগেও সে অফিসের ফুটবল খেলোয়াড় ছিল। ক্যাপ্টেন হয়েছিল বারতিনেক। একেবারে হালে খেলা ছেড়ে দিয়েছে, তবে মাতব্বরি ছাড়েনি। হাঁটুর চোট তাকে না ভোগালে হয়তো সে আরও এক-আধ বছর খেলতে পারত। খেলা ছাড়াও ঘোরাঘুরির নেশা ছিল আনন্দর। তার অফিসের দু-একজন আর বাইরের দু-তিনজন বন্ধু মিলে একটা দল করেছিল বাইরে ঘুরে বেড়াবার। একে খেলোয়াড় তার ওপর ভ্রমণ-বিশারদ বলে অফিসের অনেকেই তাকে পছন্দ করত। কাজেই ছুটি বাগিয়ে নিতে আনন্দর তেমন কোনও অসুবিধে হয়নি।

আমার কথা আলাদা। মাসের মধ্যে দশ-পনেরোটা দিন প্রায়ই আমায় কলকাতার বাইরে কাটাতে হয়। অফিস থেকে ব্যবস্থা করে নিলাম।

আনন্দ ঠিক করেছিল আমরা সাউথ ইস্টার্ন লাইন ধরে যাব। হাওড়া স্টেশন থেকে উঠব, আর রুরকেল্লা হয়ে রায়গড় পর্যন্ত চলে যাব। তারপর দেখা যাবে। যদি দরকার হয় আগেও নেমে পড়তে পারি। ট্রেন বদলাতে বা বাস পেলে বাস ধরতেও পারি। মুকুলমনোহর ত্রিবেদীর চিঠিতে পথের কোনও নিশানা দেওয়া ছিল

না। তিনি নিশ্চয় অনুমানও করেননি যে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কটোরাঘাট পর্যন্ত যাব। কটোরাঘাটেই তিনি থাকেন।

হাওড়া স্টেশনে এসে সব গোলমাল হয়ে গেল। যে ট্রেনে যাব—সেটা ঘণ্টাতিনেক পরে ছাড়ল। আমাদের রেলবাবুদের দয়ায় ট্রেন যে কখন আসে আর কখন যায় বলা মুশকিল। ঠিক-ঠিকানা নেই। তারপর যেহেতু বর্ষা এখনও বিদায় নেয়নি, কোথায় বন্যা হচ্ছে, কোথায় রেল লাইন ডুবে আছে কে বলতে পারে। দেরি তো হবেই।

ট্রেনে উঠে আনন্দ বলল, "নে, প্রথম থেকেই বাধা। এই গাড়ি যে কখন রুরকেল্লা পৌঁছবে তা জানি না। তারপর রায়গড়! রাস্তায় আরও দশ-পনেরো ঘণ্টা লেট হতে পারে।"

"আমাদের কপাল!"

"এখন তো হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ো। পরে যা হয় হবে।"

হাত-পা ছড়াবার মতন জায়গা অবশ্য আমরা পাইনি। তার ওপর দু-একটা লটবহর বাড়তি হয়ে গিয়েছে। আনন্দ ঘোরাফেরা করে বলে সে জানে, বাইরে গিয়ে অনেক সময় সাধারণ কয়েকটা জিনিসের জন্যেও অসুবিধেয় পড়তে হয় ভীষণ। একটা মামুলি টর্চ, দু-পাঁচ হাত দড়ি, অল্পস্বল্প তুলো, একটু আয়োডিন, মাথা ধরার দু-চারটে বড়িও পাওয়া যায় না দরকারে। এইরকম কত কী! কাজেই আনন্দ নানান ব্যবস্থা করে নিয়েই যাচ্ছে। তা ছাড়া আমরা যে কোথায় যাচ্ছি, কী হতে পারে ভবিষ্যতে এসব চিন্তাও সে করেছে। ফলে আরও পাঁচ-সাতটা জিনিস ভরে ফেলেছে। একটা লম্বা ধরনের ব্যাগও নিয়েছে আনন্দ। এই ব্যাগের চেহারাটা দেখতে গল্‌ফ স্টিক রাখা ব্যাগের মতন। ওর মধ্যে কী আছে আনন্দ আমায় স্পষ্ট করে বলেনি। শুধু চোখ টিপে হেসে বলেছে, "কাজে লাগতে পারে ব্রাদার। খালি হাতে অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়া

যায় না।"

"এটা অ্যাডভেঞ্চার?"

"খানিকটা তো নিশ্চয়। কোথায় যাচ্ছি জানি না! কী দেখতে পাব জানি না! কোন অবস্থায় গিয়ে পড়ব—কে বলতে পারে!"

কথাটা ঠিকই। তবু আমি বললাম, "আনন্দ, তোর কী মনে হয়?"

"কিসের?"

"বড়দা— ! মানে বড়দাকে কি ... !"

"আই ডাউট ! দু' বছরের বেশি যে-মানুষ নিখোঁজ, পাত্তা নেই—তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমার ভাই বিশ্বাস হয় না। বড়দা ছেলেমানুষ নয় যে হারিয়ে যেতে পারেন। তিনি বয়স্ক মানুষ, বুদ্ধিবিবেচনা রয়েছে, চোখে দেখতে পান—কথা বলতে পারেন—কোন যুক্তিতে বলব যে, তিনি বেঁচে আছেন—অথচ বাড়ি ফিরতে পারেননি !"

আমি মাথা নেড়ে তার কথা স্বীকার করলাম। তারপর বললাম, "সবই ঠিক রে। আমারও মনে হয়, বড়দা আর নেই। কিন্তু কী এমন ঘটল যে দাদা চলে গেল! কী হয়েছিল? অসুখ-বিসুখে মারা গেলেও একটা খবর জোগাড় করা যেতে পারে! কী বলিস?"

"তা পারে।"

"কিংবা ধর, ওই মন্দারগড়ের জ্যোৎস্নার রহস্য জানতে গিয়ে যদি কোনও বিপদ হয়ে থাকে, মারা যায় দাদা..."

আনন্দ বলল, "এখন আর অযথা ভাবিস না। আমরা তো যাচ্ছি। কী হয়েছে সেখানে গিয়েই খোঁজ করব। তুই এক কাজ কর। ডায়েরিটা আমায় দে, বসে-বসে ভাল করে পড়ি। তুইও পড়তে পারিস কিছু।"

বড়দার ডায়েরি খাতাটা আমার সুটকেসে ছিল। সুটকেস খুলে খাতাটা বার করে দিলাম আনন্দকে।

আর আমি আমার কিট ব্যাগ থেকে বড়দারই একটা বই, বাড়ি থেকে যা নিয়ে এসেছি, 'এ স্টেপ ইন দ্য ডার্ক' বার করে নিলাম।

ট্রেন তখন খানিকটা পথ এগিয়ে এসেছে। রাত হয়ে আসছিল।

কী করে যে কটোরাঘাট এসে পৌঁছলাম সে বৃত্তান্ত দিয়ে লাভ নেই। ট্রেন বদলে বাস ধরে, এখানে ওখানে হাঁ করে বসে থেকে, খোঁজ নিয়ে নিয়ে পরের দিন সন্ধেবেলায় এসে পৌঁছনো গেল কটোরাঘাটে। বৃষ্টির মধ্যে।

মুকুলমনোহর ত্রিবেদী-মশাইকে পেতে কিন্তু কোনও অসুবিধে হল না। তিনি বাস সার্ভিসের ম্যানেজার। তাঁর অফিস আর বাড়ি গায়ে-গায়ে।

কটোরঘাট পর্যন্ত কোনও সরাসরি রেল লাইন নেই। কাছাকাছি কোনও রেলের লাইন আছে বলেও শুনলাম না। আশেপাশে যেদিকেই নামো, রেল স্টেশনে নামার পর—ট্রেকার আর বাস ধরেই এসব জায়গায় আসতে হয়। পাহাড়তলি বলতে যা বোঝায়—প্রায় তাই যেন এলাকাটা। সমতলভূমি বড় চোখে পড়ে না, উঁচু-নিচু জায়গা, চারপাশে জঙ্গল, কত রকম গাছপালা, ছোট-ছোট পাহাড়ের ঢেউ, আঁকাবাঁকা বাস রাস্তা। এদিকে তখনও বর্ষা চলছিল।

আমরা দুই বাঙালি ছেলে বাসস্ট্যান্ডে নেমে ত্রিবেদীজির খোঁজ করতেই একজন তাঁর বাড়ি দেখিয়ে দিল।

চল্লিশ-পঞ্চাশ পা হাঁটতেই মুকুলমনোহরের বাড়ি পাওয়া গেল।

একতলা বাড়ি। ছোট। মাথার ছাদ খাপরার। ইটের চেয়ে

কাঠকুটোই যেন বেশি বাড়িটায়। দেওয়ালের দশ আনাই দেখি কাঠের।

ত্রিবেদীজি তখন বাড়িতেই ছিলেন।

আমাদের ডাকাডাকিতে বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই আমরা বাস থেকে নেমেছিলাম। গায়ে হালকা বর্ষাতি আমাদের, মাথায় বর্ষা-টুপি। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টি-বাদলার জন্যে আরও আঁধার দেখাচ্ছিল চার

পাশ।

মুকুলমনোহর আমাদের মতন দুই আগন্তুককে দেখে প্রথমটায় কেমন যেন ধাঁধায় পড়ে গেলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন।

নমস্কার জানিয়ে আমি নিজের পরিচয় দিলাম।

ত্রিবেদীজি হয়তো এতটা আশা করেননি, ভাবেনওনি। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার পর তিনি আমাদের নমস্কার

জানালেন। "আসুন। ভেতরে আসুন।"

বারান্দার কোণের দিকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন আমাদের। আলো আনতে বললেন কাকে যেন।

ঘরটায় আসবাবপত্র যৎসামান্য। কাঠের চেয়ার, একটা বেঞ্চি, গোল মতন টেবিল একটা, কিছু খাতাপত্র, কয়েকটা মোবিলের টিন, একটা নতুন টায়ার, বাস বা লরির।

"বসুন বাবুজি, বসুন," ত্রিবেদীজি বসতে বললেন চেয়ারে, "রেইন কোট খুলে রাখুন। আমায় দিন।"

আমরা বর্ষাতি খুলে ফেললাম। নিজেদের লটবহর রেখে দিলাম একপাশে।

"আপনারা সোজা কলকাত্তা থেকে আসছেন?"

"জি।"

"আসতে বহুত তকলিফ হল?"

"তা হয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে আসতে হল। ট্রেন, ট্রেকার, বাস ...।"

"মাফ করবেন বাবুজি। আগর আমি জানতাম আপনারা ইধার আসবেন তো চিঠ্‌টিতে ডিরেকশান দিয়ে দিতাম। আপনি কিরপানাথবাবু?"

"হ্যাঁ, আমি কৃপানাথ। এ আমার বন্ধু আনন্দ। ... আপনি আমার ঠিকানাতেই ডায়েরিটা পাঠিয়েছিলেন।"

কথাটা আগেই বলেছি, আবার বললাম ত্রিবেদীজিকে।

আলো এল। লণ্ঠন। আমরা যে ধরনের লণ্ঠন দেখি তার চেয়ে বড়। আলোও মোটামুটি মন্দ নয়।

আলো রেখে লোকটা চলে যাচ্ছিল, ত্রিবেদীজি তাকে বললেন, "আরে ছেলিয়া, চা বানাও।"

লোকটা চলে গেল। ওর নাম কি ছেলিয়া!

ত্রিবেদীজি বললেন, "বাবুজি, ওই খাতা আমার কাছে দো-তিন মাস পড়ে থাকল। বাদে আমি পাঠালাম।"

আমি বললাম, "আপনি তো বাংলা বলতে পারেন, পড়তেও পারেন ?"

"পারি ; থোড়া বহুত পারি। আমি বাংলা মুলুকে ছিলাম। রানিগঞ্জে। রেলওয়েতে কাম করতাম। যখন বিলুয়া স্টেশনে কাম করতাম, এম-পি'তে ছোটা স্টেশন—তখন আমার মাস্টারসাহেব ছিলেন দাদাজি। বাঙালিবাবু। দাদাজির কাছেও আমি বাংলা শিখেছি।"

"বাংলা মুলুকে কোথায় ছিলেন ?" আনন্দ জিজ্ঞেস করল।

"রানিগঞ্জ, অণ্ডাল।"

"আচ্ছা ! আপনি আগে রেলে চাকরি করতেন ?"

"দশ-বারো সাল করেছি। ছেড়ে দিলাম। বাদ মে কনট্রাকটারি করতাম। ছেড়ে দিলাম। আজ পাঁচ-সাত সাল বাস-সারভিসে। আমার চাচাজির বাস সারভিস আছে। চাচাজি আমায় বাস সারভিসে নিয়ে নিল।"

"আপনি তো ডায়েরিটা পড়েছেন ত্রিবেদীজি !"

"জরুর। বাংলা লেখা পড়তে পারি বাবুজি। মাগর, হ্যান্ড রাইটিং পড়তে অসুবিধা হয়। ঠোটে ঠোটে পড়েছি।"

"মানে, ধীরে-ধীরে, থেমে-থেমে ?"

"জি।"

"আপনি তো কিছু বুঝতে পারেননি ?"

"একদম না। আমার দেমাকে এল না।"

আনন্দ বলল, "আমাদেরও মাথায় আসছে না ত্রিবেদীজি ! বোকা বনে আছি। মন্দারগড় কোথায় আপনি জানেন ?"

মুকুলমনোহর মাথা নাড়লেন। বললেন, "না। আমার খেয়াল

আসে না। মাগর বাত কী জানেন বাবুজি, ইধার বহুত গড় আছে। ভীমাগড়, কাচরিগড়, ফুলিয়াগড় ... দশ-বারো গড়। দু-চারটে গড় আমি জানি। বাকি জানি না।"

"মন্দারগড় কোথায় হতে পারে ?"

মাথা নাড়লেন ত্রিবেদীজি। তিনি জানেন না। পরে বললেন, খোঁজখবর করে যা জেনেছেন তাতে মনে হয় এখান থেকে পঁচিশ-তিরিশ মাইল দূরে বিহার বর্ডারের কাছে এরকম একটা গড় থাকতে পারে। লোকে বলে, মানিদাগড়। ওই গড় এখন জঙ্গল। জনবসতি বলে কিছু নেই ওখানে। পাহাড়ি জায়গা। বিরাট-বিরাট গাছপালা আর পাথর আর খানাখন্দে ভর্তি।

আমি বললাম, "ত্রিবেদীজি, আপনি লিখেছেন—ধর্মশালার এক পাঁড়ে এসে ডায়েরি খাতাটা আপনাকে গচ্ছিত করে দেয়। সেই ধর্মশালাটা কোথায় ?"

ত্রিবেদী একটু ভেবে বললেন, "মালুম কাথগড়মে।"

"সেটা কোথায় ?"

"আট-দশ মাইল হবে।"

"এখান থেকে আট-দশ মাইল ? সেই পাঁড়েকে আপনি চেনেন ?"

"জি, না। দু-একবার দেখেছি। এই বাস জংশনে নেমে দুসরা বাসে দেশগাঁওতে যায়।"

"পাঁড়ের নাম ?"

"জানি না। পাঁড়েজি বলি।"

এবার চা এল। অ্যালুমিনিয়ামের গোল থালায় করে চা এনেছে ছেলিয়া। বড়-বড় দুই কাচের গ্লাস। চায়ের রং একেবারে সাদা। দুধ-চা যেন ! একটা বাটিতে কয়েকটা বড় বড় লাড্ডু।

ত্রিবেদীজি আমাদের চা খেতে বললেন।

চায়ের তেষ্টা আমাদের খুবই পেয়েছিল। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে চা জল কিছুই খাওয়া হয়নি। ভীষণ ক্লান্ত আমরা। বৃষ্টিতেও ভিজেছি সামান্য।

চা খেতে-খেতে আমি বললাম, "ত্রিবেদীজি, এখানে রাত কাটাবার মতন কোনও জায়গা নেই?"

উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "জরুর আছে। আপলোক এই গরিবের বাড়িতে থাকবেন?"

আনন্দ আর আমি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। "সে কী! আপনার অসুবিধে হবে।"

"না বাবুজি! কুছ অসুবিধা হবে না। আমি একলা থাকি, আর ওই ছেলিয়া। আপলোক মজাসে ইধার থাকতে পারেন।"

ভদ্রলোককে দেখলাম। বয়েস হয়তো পঞ্চাশের কাছাকাছি। ভাল স্বাস্থ্য। গায়ের রং ফরসা। মাথায় চুল কম। চোখমুখের ভাব মোলায়েম। পরনে ধুতি, গায়ে ফতুয়া ধরনের জামা।

আমরা চা খাচ্ছি, ত্রিবেদীজি হঠাৎ বললেন, "আপলোক কেন এসেছেন?" বলে একটু থেমে নিজেই আবার বললেন, "আগর ওহি বাবুজিকে খুঁজতে এসেছেন—তো ভুল করেছেন। বাহারসে যদি উসলোক আসে—দেবযান সে তব বিনা কামে আসে না। সে কি জিন্দা আর থাকে বাবুজি!"

আমরা কিছু বললাম না।

সকালে বৃষ্টি ছিল না। রোদও উঠেছে। তবু তেমন তেজ নেই রোদ্দুরের। দেখে মনে হচ্ছিল, ভেজা আকাশ এখনও যেন ভাল করে শুকিয়ে যায়নি, রোদও তাই ভেজা-ভেজা।

আমি আর আনন্দ সকালে ঘুম থেকে উঠে ত্রিবেদীজির বাড়ির বাইরে পায়চারি করতে-করতে জায়গাটা দেখছিলাম। দেখে বুঝতে পারলাম, কাল সন্ধের গোড়ায় বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে এখানে নেমে কটোরাঘাট সম্পর্কে অস্পষ্ট যে ধারণা হয়েছিল তা ঠিক নয়। এই জায়গাটা একেবারে লোকালয়হীন নয়, একপ্রান্তে পড়ে-থাকা নিছক জংলি গাঁ-গ্রামও নয়। বরং অনেকটা গঞ্জের মতন।

ত্রিবেদীজির বাড়ির গজ পঞ্চাশের মধ্যে বাস অফিস ছাড়াও একটা ডিপোর মতন আছে। বাস ডিপো। মাথায় টিনের শেড। দুটো বাসও দাঁড়িয়ে আছে। একটা টকটকে লাল রঙের, অন্যটা নীল আর সাদার ডোরা-কাটা। একটা বাসের ধোয়ামোছা চলছে। অন্যটার চাকা-খোলা। বোধ হয় টায়ার পালটানো হবে, বা অন্য কিছু গোলমাল হয়েছে বলে সারাই হবে। বাসের দু-একজন লোক দেখা যাচ্ছিল। পাজামা, গামছা, জামাটামা ঝুলছে একপাশে।

বাস ডিপোর খানিকটা তফাতে ছোট বাজার। দোকানপত্র দশ-পনেরোটা। আশেপাশে বাড়িও চোখে পড়ে। পাকা বাড়ি দুটো কি তিনটে। একতলা। বাকি সব খাপরা-ছাওয়া দেহাতি

বাড়ি। লোকজন দেখা যায়।

আনন্দ বলল, "ছোট-ছোট রেল জংশনের মতন এটা একটা বাস জংশন। বুঝলি কৃপা। এদিকে বাস সার্ভিসই ভরসা। লম্বা-লম্বা রুট।"

আমারও তাই মনে হচ্ছিল।

গাছপালার মধ্যে সেগুন গাছ এ-দিকটায় বেশি। গতকালও সেটা নজরে এসেছিল। বাস ডিপোর কাছে অবশ্য সেগুন একটা কি দুটো চোখে পড়ল। বাকি নিম আর অশ্বত্থ। অন্য গাছও আছে। চিনতে পারলাম না। তবে আম-জাম আর না চেনে কে!

ছেলিয়া এসে আমাদের ডাকল। চা-পানি তৈরি।

বাইরের বারান্দায় একটা গোল বেতের টেবিল পেতে ছেলিয়া আমাদের চা দিয়েছে খেতে। চায়ের সঙ্গে দেহাতি নিমকি বিস্কিট। গোল-গোল দেখতে। একেবারে খয়েরি রং।

কাঠের চেয়ার আর টুলে বসে আমরা চা খেতে লাগলাম। মুকুলমনোহর ত্রিবেদী আমাদের সামনে বসে। তিনিও চা-পানি খাচ্ছিলেন। একটু ইতস্তত করে জানালেন, সামান্য পরে ছেলিয়া আমাদের জন্য পরোটা আর ভাজি বানিয়ে দেবে।

আমরা হেসে বললাম, অত ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। আমরা তো খেতে আসিনি।

তারপর আবার সেই মন্দারগড়ের কথা উঠল।

ত্রিবেদীজি বললেন, "বাবুজি, আজকের দিনটা আমায় খবর নিতে দিন। সাচ বাত এই, ওহি বাঙালিবাবুর খাতা পড়ে আমি বুঝতে পারিনি। তব্‌ভি, থোড়া পাতা লাগিয়েছিলাম। কোই কুছ বলতে পারল না।"

"আপনি যে একটা গড়ের কথা বলছিলেন কাল!"

"মানিদাগড় !"

"হ্যাঁ, মানিদাগড় !"

"ঠিক-ঠিক পাতা মিলে যাবে, বাবুজি। বিহার বর্ডারের নাগিচ বলে শুনেছি।"

"আর সেই পাঁড়েজি !"

"কাথগড়মে। আট-দশ মাইল দূর।"

"আমরা সেখানে যেতে পারি না ?"

"জরুর পারেন।"

"কীভাবে যাব ত্রিবেদীজি ?"

ত্রিবেদীজি একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, "আমার বাস এই টাইমে কাথগড় যায় না। দো-তিন মাইল তফাতসে চলে যায়। আপলোগ আগর যেতে চান তো পায়দল যেতে হবে। বাস আপনাদের নামিয়ে দেবে। বাদ পায়দল।"

আমি আনন্দর দিকে তাকালাম। দু-তিন মাইল হাঁটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। কলকাতার মতন শহুরে জায়গাতেও আমরা ট্রাম-বাসে ঝুলতে না পেরে কতদিন অফিসপাড়া থেকে বন্ধুবান্ধব মিলে পায়ে হেঁটে গল্প করতে-করতে বাড়ি ফিরি।

আনন্দ বলল, "ত্রিবেদীজি, কাথগড়ের ধর্মশালায় গিয়ে আমরা তো উঠতে পারি ?"

ত্রিবেদীজি মাথা নাড়লেন। এমনভাবে নাড়লেন যে, উনি হ্যাঁ বা না বললেন বুঝতে পারলাম না।

পরে তিনি বললেন, "এই টাইমে পারবেন কী না আমি জানি না। ধরমশালা বন্ধ থাকতে পারে।"

"সে কী !"

"গরমে ধরমশালা খুলা থাকে। এপ্রিল-মে। আউর ডিসেম্বর মাহিনা থেকে দো-আড়াই মাস। সারা বছর তো খুলা থাকে না,

বাবুজি।"

আমরা দু'জনেই কথাটার মানে বুঝলাম না। গরম আর শীতে খোলা থাকে— এ কেমন ধর্মশালা! ত্রিবেদীজির দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

ত্রিবেদীজি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। বললেন যে, ওদিকে গরমের সময় একটা মেলা বসে। মহাদেবজির মন্দির আছে পুরানা। দু-আড়াইশো বছরের। সেই মন্দিরে পুজো হয়। মেলাও বসে বড় মতন। তখন ধরমশালা খোলা থাকে। মাসখানেক ধরে মেলা চলে, তারপরও যাওয়া-আসা থাকে লোকের। ধরমশালা খুলে রাখতে হয়। আর শীতে মাঘ মাসে ভবানীমায়ের পুজো হয় খানিকটা তফাতে। বিরাট মেলা বসে। সেও দেড়-দু' মাস ধরে চলে। তখন ধরমশালা খোলা থাকে। বাত এই যে বাবুজি, বিশ-পঁচিশটা গাঁ, আশপাশ থেকে লোকজন মন্দিরে পুজো দিতে যায়, মেলায় যায়। কেনাকাটা করে। সাওদা হয়। রোজগার হয় পেটের। এদিককার গাঁ-গ্রামের এই নিয়ম। ওই সময়ে আমরা বাসও ওদিককার পথ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাই। তখন আপনি টাঙা পাবেন, ভ্যান পাবেন। বয়েল গাড়িও পাবেন। এখন কিছু পাবেন না।

ত্রিবেদীজির কথায় আমরা খানিকটা হতাশ হয়ে পড়লাম। ধর্মশালায় পৌঁছনো আমাদের কাছে খুবই জরুরি ব্যাপার। ওই ধর্মশালাতেই বড়দার ডায়েরি পাওয়া গিয়েছে। বড়দা নিশ্চয় ওখানে গিয়েছিল। হয়তো ছিল কিছুদিন। ধর্মশালার পাঁড়েজি নিশ্চয় বড়দাকে দেখেছে। সেই একমাত্র লোক, যে কিছু বলতে পারে।

কিন্তু ধর্মশালা যদি বন্ধ থাকে, পাঁড়েজি না থাকে— তবে আমরা কিছুই তো জানতে পারব না! আর এতদূর এসে

কলকাতায় ফিরে যাব, আবার শীতকালে আসব, তাই কি সম্ভব !

আনন্দ বলল, "ত্রিবেদীজি, আপনি কি ঠিক-ঠিক জানেন, পাঁড়েজি এখন নেই ?"

ত্রিবেদীজি বললেন, "ধরমশালা বন্‌ধ থাকলে পাঁড়েজি থাকে না। নিজের দেশগাঁয়ে চলে যায়।"

"একটু খোঁজ করা যায় না ?"

ত্রিবেদীজি ভেবেচিন্তে বললেন, "যায়।"

"কেমন করে ?"

"বাস সার্ভিসের লোকদের—"

ত্রিবেদীজির কথা শেষ হওয়ার আগেই বাধা দিয়ে আমি বললাম, "আমরাই তো যেতে পারি ত্রিবেদীজি ! আপনি যদি বাসের ব্যবস্থা করে দেন, আমরা জায়গা মতন নেমে হেঁটে গিয়ে খোঁজ করে আসতে পারি।"

ত্রিবেদীজি মাথা নাড়লেন। বললেন, সেটা মন্দ কথা নয়। যাওয়ার সময় একটা বাস আমাদের নামিয়ে দিয়ে যাবে জায়গা মতন ; আবার বিকেলে যে-বাস আসবে— আমাদের তুলে নেবে। ত্রিবেদীজি বাসঅলাদের বলে ব্যবস্থা করে রাখবেন। তবে সে তো আর আজকে হবে না। আগামীকাল হতে পারে।

আমরা তা হলে আজ কী করব ? বসে থাকব চুপচাপ ! সময় নষ্ট করব !

ত্রিবেদীজি পরামর্শ দিলেন, আজ আমরা না হয় বিশ্রাম নিলাম। বেশি ধকল নিয়ে দরকার কী ! তা ছাড়া, বৃষ্টি আজ থামলেও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না আবার বৃষ্টি আসবে কি না ! যদি বৃষ্টি হয় তবে আমাদের পক্ষে অচেনা, অজানা জায়গায় গাছপালা-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ খুঁজে ধর্মশালায় পৌঁছনো সম্ভব নাও হতে পারে ! আবার অন্য বিপদও আছে। হয়তো পৌঁছলাম,

কিন্তু সময় মতন বাসের জায়গায় ফিরে আসতে পারলাম না। বাস তো বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবে না। তখন আমরা কী করব? কোথায় থাকব বনজঙ্গলের মধ্যে? রাত কাটাব কেমন করে?

"নেহি বাবুজি! বুঝেসুঝে কাম করা ভাল। আজ আমি দো-চারজনকে ডাকি; বাতচিত বলি। আপলোগ কাল যান।"

আমি বললাম, "আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমাদের হাতে সময় কম ত্রিবেদীজি! অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি। তাড়াতাড়ি করতে পারলেই ভাল।"

"হড়বড়িয়ে কাম হয় না। ...আপলোগ এক কাম করুন।"

"কী?"

"আমার বাস অফিসে আসুন। অফিসে আমার ম্যাপ আছে। রুট ম্যাপ। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাপ। ওহি ম্যাপ দেখুন। আইডিয়া হবে। আন্ধার মতন ঘুরে কুছ হবে না।"

আনন্দ আমার দিকে তাকাল। বলল, "কথাটা মন্দ নয়, কৃপা। আমরা তো এখানকার কিছুই জানি না। একটা আইডিয়া করতে পারলে ভাল হত।"

"তবে তাই হোক। উপায় কী!"

খানিকটা বেলায় আমরা বাস অফিসে গেলাম।

একটা জিনিস ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি। এদিককার সব কিছুই নির্ভর করে বাস আর লরির ওপর। মানুষজন তারই মুখ চেয়ে বসে থাকে। বাসই যেন প্রধান। লোকজনের আসা-যাওয়া ছাড়াও বাসের মাথায় চেপে জিনিসপত্র টুকরি গাঁঠরি আসে। যেখানে নামার, নামে। লরিতেও বিশাল-বিশাল বস্তা আর ঝুড়ি চাপানো। ব্যবসায়ীদের মালপত্র : ডালের বস্তা, আলু-পেঁয়াজের বস্তা, আরও পাঁচরকম জিনিসের চালান চলে।

ম্যাপ জিনিসটা আমার তেমন মগজে ঢোকে না। আনন্দর অভ্যেস আছে ম্যাপ দেখার।

ম্যাপ দেখতে-দেখতে আনন্দ বলল, "ত্রিবেদীজি, এদিকে দেখছি অনেক গড়।"

ত্রিবেদীজি কাজ করতে-করতে বললেন, "জি !"

আনন্দ আমায় আঙুল দিয়ে কতকগুলো জায়গা দেখাল। "এই দেখ।"

দেখলাম জায়গাগুলো। সারনগড়, নয়ানগড়, জগদীশগড়— এইরকম সব নাম। পাহাড়ি জায়গা, নদীও কম নয়, তবে ম্যাপের ছবিতে নদীগুলোকে বড়সড় মনে হল না। পাহাড়ি নদী। বোধ হয় ছোট-ছোট নদীই হবে।

ত্রিবেদীজি বললেন, "গড় এখানে বহুত পাবেন। ম্যাপে আর ক'টার নাম আছে, বাবুজি !"

"এত গড় কেন ?"

"পুরানা গড়। দো-তিনশো বছরের পুরানা। টুটেমুটে মিট্টি হয়ে গেছে, জাংগল হয়ে গেছে। তখন ছোটা-ছোটা রাজা ছিল, জায়গিরদার ছিল। লড়াই হত হরবখত। মোগল, মারাঠি ইধার-উধার থেকে ঢুকে পড়ত। গড় না হলে সেফ্‌টি ছিল না।"

আনন্দ ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ বলল, "ত্রিবেদীজি, আমার মনে হয়, এই যে একটা গড়ের রেঞ্জ দেখছি— এখানেই কোথাও মন্দারগড় আছে। ম্যাপে নাম না থাক— আমার অনুমান, আমরা এই পাহাড় আর নদীর কাছে কোথাও মন্দারগড় পেয়ে যাব।"

ত্রিবেদীজি মুখ তুললেন। তাকালেন। হঠাৎ বললেন, "পেয়ে যান তো আচ্ছি বাত। আপলোগ মোটরবাইক চালাতে জানেন ?"

আনন্দ জানত। কিন্তু আজকাল সে বাইক চালায় না পায়ে

জখমের জন্য।

আমি সে-কথা বললাম ত্রিবেদীজিকে।

ত্রিবেদীজি বললেন, মোটরবাইক চালাতে পারলে তিনি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন ঘোরাফেরার জন্য। অন্য কোনও উপায় তিনি দেখছেন না। যাই হোক, আজকের দিনটা খোঁজখবর করা যাক— কাল আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

পরের দিন ত্রিবেদীজি আমাদের বাসে উঠিয়ে দিলেন। তখন সকাল আট, সওয়া আট। ওঁর কী মনে হয়েছিল কে জানে, বাসের মাথায় দুটো সাইকেলও চাপিয়ে দিয়ে বললেন, বাস থেকে নেমে আমরা যেন সাইকেল করে কাথগড়ের দিকে যাই। পায়ে হাঁটার চেয়ে সাইকেলে যাওয়াই সুবিধের হবে। ফেরার সময় দেরি হয়ে গেলেও সাইকেল থাকলে সময়মতন বাস ধরার জায়গায় পৌঁছতে পারব।

"বাবুজি, টাইম খেয়াল রাখবেন। চার সোয়া চার। বাস পাঁচ-দশ মিনিট খাড়া থাকবে আপলোগকো উঠাবার জন্যে। দেরি হলে বাস আর খাড়া থাকবে না। আগর বাস ছুটে যায় তো আপলোগ আর ফিরতে পারবেন না।"

আমরা মাথা হেলিয়ে বললাম, বুঝেছি। ফিরতে না পারলে বিপদ। রাত কাটাবার জায়গা পাব না। বনে-জঙ্গলে গাছতলায় পড়ে থাকতে হবে। বাঘ-সিংহ না থাক, বুনো শেয়াল-কুকুর, সাপখোপ তো থাকবেই। বিশেষ করে সাপ। এখনও এদিকে

বর্ষা ফুরোয়নি। সাপখোপের দল মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো।

বাস ছেড়ে দিল।

আজ আর বাদলার কোনও চিহ্ন নেই। আকাশ পরিষ্কার। টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে; শরৎকালের মেঘ যেমন হয় সেইরকমই। তবে আমাদের বাংলাদেশের শরৎ এখানে কোথায় দেখতে পাব! এ যে একেবারে পাহাড়ি জায়গা, গাছপালার দেশ। গাছগুলোও কী বিরাট, যেন কতকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে মাথা ছড়িয়ে। পাথুরে পথ। বাসরাস্তা অবশ্য পিচের। গর্তটর্ত বেশি নেই মনে হয়—কেননা ঝাঁকুনি লাগছিল না।

সকালে স্নান সেরে, রুটি, ভাজি, দুধ-চা খেয়ে আমরা বেরিয়েছি। দুপুরের আগে খিদে পাওয়ার কথা নয়। ত্রিবেদীজি দুপুরের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। টিফিন কেরিয়ারের বাটিতে পরোটা আর আলুর তরকারি। পুদিনার চাটনিও খানিকটা। শালপাতায় মোড়া কয়েকটা লাড্ডু। জলের ফ্লাস্ক তো আমাদের আছেই।

আনন্দর কথামতন আমরা খানিকটা সেজেগুজেই বেরিয়েছি। মানে, বর্ষাতি নিতে ভুলিনি; কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে টুকিটাকি অনেক কিছুই আছে: টর্চ, ছুরি, ব্যাণ্ডেজ, তুলো, একটা মামুলি বায়নাকুলার, ক্যামেরা। ক্যামেরাটা আনন্দর। সে ভাল ফোটো তুলতে পারে। আমাদের সাজগোজও টুরিস্টদের মতন। জিন্‌সের প্যান্ট, গায়ে জ্যাকেট। পায়ে ক্যাম্বিসের বুটজুতো।

বাসের যাত্রীরা আমাদের দেখছিল। ওদের মধ্যে বেশিরভাগই সাধারণ মানুষ, দেহাতি ধরনের। পাঁচ-সাতজন বোধ হয় আধা-শহুরে। তাদের চোখমুখ, বেশবাস, মুখ ভরতি পান-জরদা

আর কথাবার্তা থেকে তাই মনে হয়।

আমরা দুটি বাঙালি ছোকরা হাল ফ্যাশানের সাজগোজ করে কোথায় চলেছি জানার জন্য তাদের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক।

মুশকিল হল, ওদের চলতি হিন্দি আর মুখের বুলি আমরা সব বুঝতে পারছিলাম না। নিজেদের কথাও বোঝাতে পারছিলাম না। তবু কথাবার্তা হচ্ছিল মাঝে-মাঝেই।

এক ভদ্রলোক, ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিলেন নিজের, নাম বললেন, শিবলাল, বেশ আলাপী।

তাঁর সঙ্গে কথায়-কথায় জানতে পারলাম, মন্দারগড় বলে কোনও জায়গা এদিকে নেই। তিনি অন্তত জানেন না। কাথগড় অবশ্য আছে। আছে আরও অনেক গড়। তবে নামেই গড়, পুরনো গড়ের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। দু-একটা গড় ভাঙাচোরা অবস্থায় এখনও পড়ে আছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে মানুষজন থাকে না।

ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, আমরা কোথায় যাচ্ছি? কী-বা উদ্দেশ্য আমাদের।

আনন্দ চালাক ছেলে। চটপট বলল, "আমরা কলকাতায় একটা সার্ভে অফিসে কাজ করি। অফিসের কাজে যাচ্ছি। কিছু খোঁজখবর নিয়ে ফিরে যাব।"

শিবলালজি বিশ্বাস করে নিলেন কথাটা। বললেন, পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে এদিকে একবার ভূমিকম্প হয়। সেই ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির তেমন বেশি না হলেও একটা জায়গা একেবারে ধসে পাতালে চলে গিয়েছিল। প্রায় সিকি মাইল মতন হবে সেই পাহাড়ি জায়গাটা। লোকে বলাবলি করত, কামান দাগার মতন ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা গিয়েছিল গোটা একটা দিন ওই জায়গাটা থেকে।"

আমরা কথাটা শুনলাম ; তেমন কান করলাম না। কবে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে এদিকে ভূমিকম্প হয়েছিল সে-গল্প শুনে লাভ কিসের !

একটা জায়গায় এসে বাস থামল।

আমাদের দু'জনকে নামতে হবে। এখানে নেমেই যেতে হবে কাথগড়ে। বাসের দুই কণ্ডাক্টর, একজন প্রায় ভীমের মতন মোটাসোটা, অন্যজন রোগা পাতলা—আমাদের সাইকেল নামিয়ে দিল বাসের মাথা থেকে।

সাইকেল নামিয়ে দিয়ে মোটা বলল, চারটের মধ্যে যেন ফিরে এসে এখানে দাঁড়াই।

বাস চলে গেল।

সে-জায়গাটায় আমরা নামলাম তার কাছাকাছি কোনও লোকবসতি নেই। দেখতে তো পেলাম না। তবে রাস্তার পাশে একটা ছাউনি মতন আছে। কয়েকটা কাঠের খুঁটি, মাথার ওপর পাতার ছাউনি। রোদে-জলে পাতাগুলো পচে গিয়েছে। ওরই হাত কয়েক তফাতে একটা পাথর, মাটির মধ্যে পোঁতা। পাথরের গায়ে আলকাতরা দিয়ে একটা চিহ্ন আঁকা। বোঝা গেল, কাথগড়ে যাওয়ার নিশানা এটা।

আনন্দ ঘড়ি দেখল। বলল, "ন'টা বাজল। তোর ঘড়ির সঙ্গে একবার মিলিয়ে নে। টাইমের গোলমাল হয়ে গেলে চারটের মধ্যে ফিরতে পারব না।"

আমি আমার হাত-ঘড়ি দেখলাম। সময় ঠিকই আছে।

"নে, তা হলে সাইকেলে উঠে পড়।"

"আগে খানিকটা হাঁটা যাক। পা ছাড়িয়ে নি। পরে সাইকেলে উঠব।"

"বেশ, চল।"

আমরা সাইকেল ঠেলতে-ঠেলতে হাঁটতে লাগলাম।

কাথগড়ের রাস্তা পাকা নয়। তবে এদিককার মাটি শক্ত, রুক্ষ আর পাথুরে বলে কাঁচা রাস্তাও পাকার মতন মনে হয়। ত্রিবেদীজি বলেছেন, মেলার সময় বাস, ট্রেকার, বয়েলগাড়ি, মায় জিপ পর্যন্ত এই রাস্তা ধরে কাথগড় পর্যন্ত যায়। যায় যে, বুঝতে আমাদের কষ্ট হল না। খুব চওড়া না হলেও গাড়ি যাওয়ার মতন চওড়া তো বটেই রাস্তাটা।

গাছ আর গাছ, দু' পাশে শুধু গাছ। মাঝে-মাঝে ফাঁকা। আশেপাশে তাকালে উঁচু-নিচু পাথরছড়ানো মাঠ চোখে পড়ে। মাঠের মধ্যে ঝোপ। এখানে শালগাছও চোখে পড়েছিল। মহানিম আর কাঁঠালগাছও। বাকি গাছটাছ চিনতে পারছিলাম

না। পাখিও ডাকছিল। রোদ চড়ে উঠল ক্রমশ।

আরও একটু এগিয়ে আমরা সাইকেলে উঠলাম।

আনন্দর একটা হাঁটুতে চোট ছিল, আগেই বলেছি। তাতে অবশ্য তার সাইকেল চালাতে অসুবিধে হচ্ছিল না।

যেতে-যেতে আনন্দ বলল, "কৃপা, ধর্মশালাটা যদি খোলা পাই, দারুণ হবে!"

আমি বললাম, "যদি পাই— ! পাওয়ার তো আশা নেই।"

"বাই চান্স যদি পেয়ে যাই।"

"পেলে ভাল।"

"পাঁড়েজিকে পেয়ে যাব।"

"ত্রিবেদীজি তো বললেন, পাঁড়েজি এ-সময় থাকে না। ধর্মশালাও বন্ধ থাকে।"

আনন্দ মজা করে বলল, "পাইলেও পাইতে পারি পাঁড়েজি রতন। লাক্! কৃপা, জাস্ট লাক্।"

রাস্তার বেশিরভাগটাই চড়াই। সাইকেল নিয়ে চড়াই উঠতে খানিকটা কষ্টই হচ্ছিল। অভ্যেস তো নেই। তার ওপর আশপাশ দেখতে-দেখতে এগুচ্ছিলাম। সময় নষ্ট হচ্ছিল। তা হোক। সারা দুপুর পড়ে রয়েছে, কত আর সময় নষ্ট হবে! আনন্দ দু-চারটে ফোটো তুলল।

একটা জিনিস লক্ষ করলাম। জায়গাটা যদিও পাহাড়তলি, গাছপালায় ভরতি, মাঝে-মাঝে ফাঁকা জমি, মাঠ, তবু ওরই মধ্যে কোথাও-কোথাও এমন এক-একটা গভীর ঝোপজঙ্গল চোখে পড়ে যে, মনে হয়—ওই ঝোপের মধ্যে আলোও ঢোকে না। অন্ধকার ছাড়া সেখানে কিছু নেই।

শেষপর্যন্ত ধর্মশালাটা পাওয়া গেল।

কাছে গিয়ে সাইকেল থেকে নামলাম। ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজে। রোদ খুব চড়া। জঙ্গলের বাতাসও দিচ্ছিল।

ধর্মশালার বাড়িটা দেখতে কালো। পাথরের বাড়ি। মাথার ওপর টিনের ছাদ। চারপাশে ভাঙাচোরা পাঁচিল। সদরের মুখেই কুয়া। সদর খোলা ছিল। পাঁচিলের গায়ে বুনো গাছ, আতা ঝোপ, করবীফুলের ঝাড়।

সদর খোলা দেখে আনন্দ অবাক হয়ে বলল, "রুপা, দেখছিস! সদর দরজা খোলা।"

আমরা সাইকেল দুটো সদরের পাশে দাঁড় করিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম। পাথর-বিছানো চাতাল। তিনদিক ঘিরে ছোট-ছোট কয়েকটা ঘর। ঘরের গা-লাগানো বারান্দা। সরু।

আনন্দ হাঁক দিল, "কোই হ্যায় জি ?"

বার-দুই হাঁক দেওয়ার পর কে একজন গুহার মতন এক ঘর থেকে বেরিয়ে এল। খালি গা, পরনে খাটো আধময়লা ধুতি, মোটা এক পইতে ঝুলছে গলায়।

লোকটা কাছে এসে আমাদের দেখল। রীতিমতন অবাক হয়েছে।

আনন্দ বলল, "আপহি মালুম পাঁড়েজি!"

লোকটা ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, সে পাঁড়েজি!

আমরাও কি কম অবাক! পাঁড়েজির তো এ-সময় থাকার কথা নয়। ধর্মশালা বন্ধ। তবু সে কোথা থেকে হাজির হল!

আনন্দ আলাপী ছেলে। চট করে লোকের মন ভোলাতে পারে। হাসি-হাসি মুখ করে বলল, "আমরা ত্রিবেদীজির কাছ থেকে আসছি। ত্রিবেদী বলেছিলেন, ধর্মশালা এখন বন্ধ থাকে, পাঁড়েজিকে বোধ হয় পাব না। তা আমাদের ভাগ্য ভাল, পাঁড়েজিকে পেয়ে গেলাম।"

পাঁড়েজি বলল, ত্রিবেদীজি ঠিকই বলেছেন, এ-সময় সে থাকে না। তবে আজ দু-তিনদিন হল পাঁড়েজি এখানে এসেছে। সঙ্গে এক সাথী। নাম লালা। এই ধরমশালাতেই কাজ করে। ধরমশালার মালিক তাকে পাঠিয়েছে। থোড়া বহুত কাম আছে এখানে। সারাইওরাই হবে। দু-একদিনের মধ্যে মিস্ত্রি মজুর আসবে মালিকের কাছ থেকে, মালপত্র আসবে লরি করে। বিশ-বাইশ দিন কাম হবে এখানে। পাঁড়েজিকে আসতেই হল।

আনন্দ হাসিমুখে বলল, "ত্রিবেদীজি তো জানতে পারলেন না? পাঁড়েজির সঙ্গে দেখা হয়নি?"

দেখা হওয়ার কথা নয়। পাঁড়েজি তো কটোরাঘাট হয়ে আসেনি এবার। উলটো পথে এসেছে, মাধোপুর দিয়ে।

"আপলোগ কোন্ মুলুক থেকে এসেছেন, বাবু? বাংলা?"

"বাংলা।"

"মন্দির দেখতে এসেছেন?"

"না।"

"তব্?"

আমি বললাম, "জরুরি কামে এসেছি, পাঁড়েজি। আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। ত্রিবেদীজি আমাদের পাঠিয়েছেন। একটা খাতা আপনি ত্রিবেদীজিকে দিয়েছিলেন। খাতাটা আমার বড়দাদার। আমি..."

পাঁড়েজি কী বুঝল কে জানে! মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে। পরে বাতচিত হবে। এখন পাঁড়েজি স্নানে যাচ্ছে। আমরা আপাতত খানিকটা জিরিয়ে নিই।

পাঁড়েজি একটা দড়ির খাটিয়া বার করে আনল কোথা থেকে। ছায়ায় রাখল। বসতে বলল। লালাকে দেখতে পেলাম না। তবে একটা নেকড়ে বাঘের মতন কুকুরকে দেখতে পেলাম।

ধর্মশালার পোষা কুকুর হয়তো।

একপক্ষে ভালই হল। আমরা সামান্য ক্লান্ত বোধ করছিলাম। খানিকটা জিরিয়ে নেওয়াই ভাল।

আনন্দ তার ঝোলা থেকে টিফিন কেরিয়ারের বাটি, শালপাতায় মোড়া খাবারদাবার বার করল।

"নে, খেয়ে নে। আগে জল দে। ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে।"

জলের ফ্ল্যাস্ক বার করলাম আমি।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে বাইরে গেলাম।

কুয়াতলায় দড়ি-বালতি পড়ে ছিল। জল তুলে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। চমৎকার জল।

আনন্দ সিগারেটের প্যাকেট বার করল।

আমরা আবার ভেতরে এসে দড়ির খাটিয়ায় বসলাম।

পাঁড়েজি এল ঘণ্টাখানেক পরে। স্নান-খাওয়া সেরে এসেছে।

খাতার কথাটাই তুললাম প্রথমে। কেমন করে খাতাটা আমার কাছে গেল, আর কেনই-বা আমরা এখানে এসেছি, বললাম পাঁড়েজিকে।

সব শুনে পাঁড়েজি বলল, "এই ধর্মশালায় এক বাঙালিবাবু কিছুদিন ছিলেন। দেড়-দু' হপ্তা। তারপর একদিন উধাও হয়ে যান, আর ফেরেননি।"

"কতদিন আগে তিনি ছিলেন এখানে?"

"পিছলা সালমে।"

"কেমন দেখতে ছিলেন?"

পাঁড়েজি বর্ণনা দিল বাঙালিবাবুর।

বড়দার চেহারার সঙ্গে মিলে গেল বর্ণনা। দাড়িগোঁফ

রেখেছিল বড়দা—সেটা অনুমান করা যায়।

আনন্দ বলল, "পাঁড়েজি, বাঙালিবাবু কিছু বলতেন? মন্দারগড় বলে কোনও জায়গার কথা?"

পাঁড়েজি কী যেন ভাবল, তারপর বলল, "জি! আপনা খেয়ালে বলতেন। বাবু বলতেন, আট-দশ মাইল দূর মে একটা আজব জায়গা আছে। আমরা বাবু জানি কোই গড়ওড় নেহি উধার। মাগর, বহুত ভারি জঙ্গল আছে। এক তালাও ভি আছে।"

আনন্দ বলল, "জায়গাটার নাম কি মন্দারগড়!"

"মাহিনদাগড়। আমি উধার যাইনি বাবু। কোই যায় না।"

"কেন?"

"বহুত খারাপ জায়গা। যো যায় ও আর ফেরে না।"

পাঁড়েজি মানুষটি সাদামাঠা। গিরিলাল ধর্মশালার দেখাশোনা করছে বছর পাঁচেক। তার আগে নিজের দেশ-গাঁয়ে থাকত। ছোটখাটো ক্ষেতির কাজকর্ম দেখত, আর মাঝেসাঝে বদ্রীবাবু বলে এক ভদ্রলোকের দলের সঙ্গে তীর্থ করে বেড়াত। এখানের ধর্মশালায় তার কাজকর্ম বেশি নয়, তবে বছরে যে দু'বার লোকজন আসে—তার সামান্য আগে থেকে পাঁড়েজিকে আসতে হয়। ধর্মশালা ফাঁকা হওয়ার পরও থাকতে হয় আট-দশদিন। লালা তার বরাবরের সঙ্গী। কাছাকাছি গ্রামের মানুষ তারা।

পাঁড়েজি যা বলল তার থেকে মনে হল, এক বাঙালিবাবু

এখানে এসেছিলেন। এবং ছিলেন কিছুদিন। ধর্মশালা তখন প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। পাঁড়েজিও ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। ওই সময়ে একদিন বাঙালিবাবু কোথায় যে বেরিয়ে যান, আর ফিরে আসেননি। পাঁড়েজি দিন-দুই অপেক্ষা করেছে বাবুর জন্য। লালাকে সঙ্গে করে কাছেপিঠে খোঁজখবরও করেছে। বাঙালিবাবুর কোনও খোঁজ পায়নি।

এখানে কাছাকাছি কোনও পুলিশ চৌকি নেই, কোতোয়ালিও নেই যে, ঘটনাটা জানিয়ে যাবে। পাঁড়েজি কিছুই জানাতে পারেনি। তবে বাঙালিবাবুর ঘরে খাটিয়ার পাশে একটা খাতা পড়ে ছিল। পাঁড়েজি সেটি তুলে রেখে দেয়। অনেক পরে একসময় ত্রিবেদীজিকে দিয়ে আসে। খাতাটা বাবুজির, কিন্তু তাতে কী লেখা আছে সে জানে না। মামুলি হিন্দি পড়াশোনা আর হিসাব রাখার কাজ ছাড়া পাঁড়েজি আর কিছু করতে পারে না।

আনন্দ বলল, "বাবু কোথায় ঘুরতে যেতেন কিছু বলেননি ?"

"না।"

"যেদিন চলে যান—আর ফিরে এলেন না—সেদিন কিছু বলে যাননি ?"

"কুছ না।"

"সঙ্গে কিছু ছিল ?"

পাঁড়েজি মনে করল, বলল, "একটা লাঠি ছিল হাতে, আর জলের বোতল।"

কথাবার্তা আর বেশি কিছু হল না। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের ফিরতে হবে। ফেরার আগে আশপাশে চোখ বুলিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে। তবে যাই করি, ঘড়ি ধরে করতে হবে—নয়তো বাস ধরার জন্য জায়গামতন পৌঁছতে পারব না।

আনন্দ বলল, "চল, আজ উঠি। একটা কাজ তো হল।"

আমি বললাম, "দাঁড়া। একটু কথা বলে নিই পাঁড়েজির সঙ্গে।.... আমরা যদি এখানে এসে এই ধর্মশালায় উঠি, থাকি দু-চারদিন—, এখান থেকে মানিদারগড় মন্দারগড় যাই হোক—তার একটা খোঁজ করতে পারব। কী বলিস তুই ?"

আনন্দ বলল, "বলার কী আছে ! এখানেই থাকতে হবে।"

"পাঁড়েজিকে জিজ্ঞেস করে নি।"

পাঁড়েজিকে কথাটা বলতেই সে রাজি হয়ে গেল। ধর্মশালা তো ফাঁকাই পড়ে আছে। মিস্ত্রিমজুর এলে কাজকর্ম শুরু হবে। আমরা যদি থাকতে চাই অনায়াসে থাকতে পারি।

আর দেরি করার কারণ ছিল না। আমরা আবার সাইকেল' নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কাছাকাছি ঘোরাফেরা করার সময় মনে হল না, ঠিক এই জায়গাটায় অঘটন ঘটার কোনও কারণ থাকতে পারে। পাহাড়ি জায়গা ঠিকই—তবে মোটামুটি সমতল। ঘন জঙ্গলও কাছাকাছি দেখা যায় না। দূরে অবশ্য পাহারের ঢল চোখে পড়ে, এখন রোদে কেমন কালচে হয়ে আছে পাহাড়ের মাথা।

আনন্দ বলল, "কৃপা, এত শান্ত সুন্দর জায়গা—কে বলবে এরই কোথাও মানুষ হারিয়ে যেতে পারে।"

আমি মাথা নেড়ে ওর কথায় সায় জানালাম।

আরও একটু পরে আমরা ফিরতে লাগলাম বাস ধরার জন্য।

সন্ধেবেলায় ত্রিবেদীজির সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছিল।

আমরা সময়মতন বাস ধরে কটোরাঘাট ফিরে আসায় ত্রিবেদীজি যেন অনেকটা হালকা হয়ে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক সামান্যতেই দুশ্চিন্তা করেন বেশি। তাঁর হয়তো ভয় ছিল, আমরা দুই কলকাতার ছেলে-ছোকরা ধর্মশালা খুঁজতে গিয়ে বনে-জঙ্গলে

হারিয়ে না যাই! কিংবা একটা ঝঞ্ঝাট না বাঁধিয়ে বসি। সেসব কিছু হল না; আমরা সময়মতন বাস ধরে ফিরতে পেরেছি—এতেই তিনি খুশি।

পাঁড়েজির দেখা আমরা পেয়েছি শুনে ত্রিবেদীজি বললেন, "আপনাদের লাক ভাল, বাবুজি! গুড লাক।"

পাঁড়েজির সঙ্গে কেমন করে দেখা হয়ে গেল, কেন যে সে এখন ধর্মশালায় এসেছে, একজন লোকও রয়েছে সঙ্গে, দু-একদিনের মধ্যেই মিস্ত্রিমজুর, মালপত্র এসে যাবে ধর্মশালার সারাইয়ের কাজে—সব বৃত্তান্তই দিলাম ত্রিবেদীজিকে।

ত্রিবেদীজি শুনলেন।

বড়দা যে ওই ধর্মশালায় ছিল তাও ঠিক। পাঁড়েজির বর্ণনার সঙ্গে বড়দার চেহারার বর্ণনা মিলে যায়। সেদিক থেকে আর কোনও সন্দেহের কারণ নেই।

কিন্তু, মুশকিল হল, বড়দা যে কেন একদিন ধর্মশালা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, পাঁড়েজি জানে না।

ত্রিবেদীজি কী ভেবে বললেন, "সে তো সালভরের বেশি হল?"

"হ্যাঁ, তা হয়েছে। হিসেবের আন্দাজ ধরলে তাই হয়!"

"তো এখন ওহি বাবুকে কোথায় খুঁজে পাবেন?"

খুঁজে পাওয়ার আশা আমরাও করছিলাম না। তবু বললাম, "খুঁজে না পাই—কী হয়েছে জানতে পারলে স্বস্তি পাই, ত্রিবেদীজি।"

আনন্দ বলল, "ত্রিবেদীজি, জায়গাটা যা দেখলাম আর শুনলাম তাতে যদি এমন হয় যে কোনও বুনো পশুর হাতে দাদার প্রাণ গিয়েছে জানতে পারি—তবু বুঝব তাঁর অদৃশ্য হওয়ার কারণ আছে। কিন্তু ওই জ্যোৎস্নার কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি

না। তা ছাড়া এটাও তো অদ্ভুত ব্যাপার যে, জ্যোৎস্নাই শুধু নয়—একটা নৌকো ধরনের জিনিস ওই জ্যোৎস্নার মধ্যে মাঝে-মাঝে বাতাসে শূন্যে ভেসে বেড়ায়। এটা কেমন করে সম্ভব!"

ত্রিবেদীজি কিছুই বললেন না।

আমি বললাম, "ত্রিবেদীজি, আমরা ওই ধর্মশালায় গিয়ে দিন কয়েক থাকব। পাঁড়েজির সঙ্গে কথাবার্তা বলে এসেছি।"

ত্রিবেদীজি বললেন, "যাবেন। জরুর যাবেন।" বলে তিনি যেন একটু ঠাট্টার গলায় বললেন, "ধরমশালায় আউর কুছ মিলবে বাবুজি?"

"ধর্মশালা থেকে আমরা মানিদাগড় যাব।"

"আউর?"

"আশপাশের ভাঙা গড় দেখব। খুঁজব।"

"ঠিক। মাগর ক্যায়সে দেখবেন, ঢুঁড়বেন? পায়দল! পঁচিশ-তিরিশ মাইল পাহাড়ি জায়গা আপলোগ পায়দল ঢুঁড়ে বেড়াবেন!

আনন্দ বলল, "উপায় কী!"

ত্রিবেদীজি যেন আমাদের ছেলেমানুষি দেখে অখুশি হয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন। পরে বললেন, "ঠিক-ঠিক পাতা লাগাতে চান তো বুঝসুঝ কাম করতে হবে।"

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু অন্য কোনও উপায় যখন নেই তখন পায়ে হেঁটে বা ত্রিবেদীজির দেওয়া সাইকেল নিয়ে ঘোরাফেরা করা ছাড়া আমরা আর কী করতে পারি!

আনন্দ আর আমি ভাবনা-চিন্তা কম করিনি। আমাদের মনে হয়েছে, পাঁড়েজির গিরিলাল ধর্মশালা থেকে জায়গাটা খুব বেশি দূরে হওয়ার কথা নয়। কেন না, বড়দা যদি মন্দারগড় বলে

কোনও জায়গার খোঁজে গিয়ে থাকে—তা হলে সে কাছাকাছি আস্তানা বলতে তো ওই ধর্মশালাই বেছে নিয়েছিল। সেখান থেকেই খোঁজখবর করত। মন্দারগড় বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে হলে বড়দা নিশ্চয় অতটা পথ পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াত না। সেটা সম্ভব নয়। কাজেই মন্দারগড় বলে যদি কোনও জায়গা থেকে থাকে তবে সেটা ধর্মশালা থেকে অনেক দূরে হওয়ার কথা নয়।

কথাটা ত্রিবেদীজিকে আমরা বললাম।

তিনি বললেন, "ধর্মশালার দু-এক মাইলের মধ্যে এমন অদ্ভুত কোনও জায়গা থাকলে সেটা এখানকার লোকের কানে আসত। ধর্মশালার পাঁড়েজি জানত।"

আমি বললাম, "পাঁড়েজি বলেছে মাহিনদাগড় বলে একটা জায়গা আছে ওদিকে। আট-দশ মাইল তফাতে। জায়গাটায় কেউ যায় না। সেখানে ঘন জঙ্গল আর একটা তলাও আছে। অভিশপ্ত জায়গা। কেউ গেলে আর ফিরে আসে না।"

ত্রিবেদীজি বোধ হয় অন্য কথা ভাবছিলেন। অন্যমনস্কভাবে বললেন, "আপলোগ কো এক গাড়ি চাই। জিপ। জিপ চালাতে জানেন ?"

আমি মাথা নাড়লাম, জানি না। আনন্দ মোটরবাইক চালাতে জানত, আজকাল আর চালায় না। জিপগাড়ি সে চালাতে জানে কি না আমি জানি না।

আনন্দ বলল, শখ করে দু-একবার জিপ চালাবার চেষ্টা করেছে বটে—তবে তার অভ্যেস নেই।

ত্রিবেদীজি বললেন, "ড্রাইভার মিলে যাবে। বাহাদুর। নেপালি। আমার চেনা আদমি। মগন সিংয়ের জিপটার এঞ্জিন সারাই করার কাম ছিল। ওহি জিপ আগর মিলে যায় তো আচ্ছা, না মিললে—" বলতে বলতে থেমে গেলেন ত্রিবেদীজি। হঠাৎ

তাঁর কী যেন মনে পড়ে গেল। বললেন, "ট্রেকার ?"

"ট্রেকার।" আমরা অবাক। এখানে ট্রেকার কোথায় পাব ?

আনন্দ বলল, "আপনি যে কী বলেন ত্রিবেদীজি! ট্রেকার কোথায় পাব ? যদি-বা জোটে—ট্রেকার নিয়ে ঘুরে বেড়াবার মতন টাকা আমাদের কোথায় ?"

ত্রিবেদীজি যেন মস্ত একটা ধাঁধার জবাব পেয়ে গিয়েছেন। নিশ্চিন্ত মুখ করে বললেন, "কুমারসাহেব।"

"কুমারসাহেব! তিনি কে ?"

"আমার চাচাজির দোস্ত। কুমারসাহেবের বাড়ি ছিল জব্বলপুর। ঘরবাড়ি আছে; সাহেবরা থাকেন না। কুমারসাহেব উহিয়াপুরে কোঠি বানিয়েছেন। সাহেবের ফার্ম আছে, বাগিচা আছে। বড়া শিকারী। লেখাপড়া-জানা আদমি। বহুত কুছ জানেন।"

"তা না হয় হল—কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী!"

"কুমারসাহেব কাল আমার কাছে আসবেন। খবর ভেজেছেন। সাহেবের ট্রেকার আছে।"

আনন্দ আর আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। কে কুমারসাহেব জানি না, তিনি হয়তো ধনী লোক, তাঁর ট্রেকারও থাকতে পারে—তা বলে আমরা সেই ট্রেকার পাব কেন ? তিনিই বা দেবেন কেন ?

ত্রিবেদীজিকে কথাটা বোঝাবার আগেই তিনি আমাদের ভরসা দিয়ে বললেন যে, কুমারসাহেবের ভাবনা তাঁর।

তখনকার মতন আমাদের বৈঠক শেষ হল।

পরের দিন দুপুর নাগাদ কুমারসাহেব এলেন। ট্রেকার নিয়েই। সঙ্গে তাঁর ড্রাইভার আর বেয়ারা বা কাজের লোক।

ভদ্রলোকের চেহারাটি দেখার মতন। মাথায় লম্বা, ছিপছিপে গড়ন, টকটকে ফরসা রং। বছর ষাট বয়েস। বয়েসের ছাপ তেমন চোখে পড়ে না। মাথার চুল অবশ্য সব সাদা। দাড়ি রয়েছে কুমারসাহেবের। দাড়ি অতটা সাদা হয়ে ওঠেনি। ওঁকে দেখলে যথেষ্ট অভিজাত বলেই মনে হয়। হাসিখুশি মুখ।

কুমারসাহেবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন ত্রিবেদীজি। আমরা কেন এখানে এসেছি—তাও মোটামুটি বুঝিয়ে বললেন। কুমারসাহেবের যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না কথাগুলো। অথচ কৌতূহল বোধ করছিলেন। সব শুনে বললেন যে, ওই মাহিনদাগড় বা মানিনদাগড় এরিয়াটা উনি জানেন। কিন্তু ওখানে তো কেউ যায় না, যাওয়ার হুকুম নেই।

"কেন?"

"প্রোটেকটেড এরিয়া।"

আমরা কিছুই বুঝলাম না।

কুমারসাহেব বললেন, কেন যে ওখানে কাউকে যেতে দেওয়া হয় না— তা তিনিও জানেন না। তবে একটা কথা শোনা যায়। ব্যাপারটার সত্যি-মিথ্যে বলতে পারবেন না তিনি।

তারপর ঘটনাটার কথা বললেন। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ওই পাহাড়ি জঙ্গল এলাকায় ব্রিটিশ মিলিটারিদের একটা গোপন অ্যামুনিশান স্টোর ছিল। শোনা যায়, হাই এক্সপ্লোসিভ বোমাটোমা মজুত থাকত। আন্ডারগ্রাউন্ড শেড ছিল। ফাইটার প্লেনও ওঠানামা করত মাঝে-মাঝে। যুদ্ধের শেষে একদিন অ্যামুনিশান স্টোরে দুর্ঘটনা ঘটে। আগুন লেগে যায়। ভীষণ অবস্থা হয়েছিল। যত আওয়াজ, তত আগুন। ভূমিকম্পের মতন নড়ে উঠেছিল পুরো এলাকাটা। তারপর থেকেই বোধ হয় ওটা প্রোটেকটেড এরিয়া হয়ে যায়। ... অনেকের সন্দেহ,

আন্ডারগ্রাউন্ডে এখনও কিছু এক্সপ্লোসিভ থাকতে পারে।

কুমারসাহেব এই ঘটনার কথা তাঁর বাবা, মামার কাছেও শুনেছেন। তখন তো তিনি বালক ছিলেন। থাকতেন জব্বলপুরে।

আনন্দ আর আমি কুমারসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। যেন জানতে চাইছিলাম, তা হলে এখন কী করা যায়?

কুমারসাহেব নিজেই হঠাৎ বললেন, "ও-কে। আমরা ওই জায়গাটায় যাব, তোমাদের আমি নিয়ে যাব, গাইড না করলে তোমরা যেতে পারবে না।"

কুমারসাহেবের কথাবার্তা শুনে আমাদের প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল—উনি খুব ভাল বাংলা জানেন।

আনন্দ কথাটা জিজ্ঞেস করতেই কুমারসাহেব হাসতে-হাসতে বললেন, "কলকাতায় আমাদের বাড়ি আছে। ভবানীপুরে। ব্যবসা আছে। ফ্যামিলি বিজনেস। আমি ব্যবসা দেখি না। তবে কলকাতায় যাই। সেখানে আমার অনেক বন্ধু আছে হে ইয়ংম্যান। আমি মেডিকেল পড়েছি কলকাতায়। কোর্সটা কমপ্লিট করতে পারিনি, সার্জারিতে ফেল করতাম বারবার।"

কুমারসাহেব হো হো করে হাসতে লাগলেন।

কুমারসাহেব হলেন প্রবীণ লোক, আমাদের মতন ছেলে-ছোকরার হঠকারিতা তাঁর নেই। তবে উৎসাহ আছে; প্রবল উৎসাহ।

সেদিন সন্ধেবেলা কুমারসাহেবকে ঘিরে আমাদের আলোচনা হল অনেকক্ষণ। প্রথমেই যা দেখলাম, কুমারসাহেব এমন একটা ব্যবস্থা করছেন যেন আমরা কোনও শিকারের ক্যাম্প বসাতে যাচ্ছি কোথাও। গাড়ির তেল-মোবিলের ব্যবস্থা থেকে নিজেদের থাকা-খাওয়ার সবরকম ব্যবস্থা তিনি করে ফেললেন। একটাই অসুবিধে হল, কুমারসাহেব তো তাঁবুর ব্যবস্থা করে আসেননি— কাজেই বনে-জঙ্গলে তাঁবু ফেলে থাকতে পারবেন না, পাঁড়েজির ধর্মশালাতেই থাকতে হবে।

ব্যবস্থা পাকা করে কুমারসাহেব বললেন, "ডায়েরিতে কী লেখা আছে একবার পড়ো। ভাল করে শুনি।"

ডায়েরি খাতাটা আমার কাছে-কাছে থাকে। পড়লাম, যা লেখা ছিল।

মন দিয়ে শুনলেন কুমারসাহেব ; তারপর বললেন, "স্ট্রেঞ্জ ! আমি এতকাল আছি এদিকে— এত ঘোরাফেরা করেছি— কিন্তু তোমাদের ওই জ্যোৎস্নার কথা তো শুনিনি। প্রোটেক্টেড এরিয়ার কথা যা শুনেছি, বলেছি তোমাদের।"

আমি যেন একটু আহত হয়ে বললাম, "কথাটা কি মিথ্যে বলছেন ?"

কুমারসাহেব মাথা নাড়লেন। "না, তা বলছি না। তবে এরকম একটা ঘটনার কথা এখানে কেউ জানবে না, এ কেমন করে হয় !"

"যদি না হয় তবে দাদা খবরটা পাবেন কোথা থেকে ?"

কুমারসাহেব মাথা নাড়লেন, তা ঠিকই। তারপর বললেন, "গুজব নয় তো ! চোখের ভুলে কতরকম গুজব রটে। আবার গুজব নিয়ে বইপত্রও লেখা হয়। দেখো, আমি নিজে একটু-আধটু ইউ. এফ. ও. নিয়ে বইপত্র দেখেছি। আমার ইন্টারেস্টও আছে।

কিন্তু দেখলাম— ওই যে গ্রহান্তর থেকে মাঝে-মাঝে এটা-সেটা আমাদের পৃথিবীতে নেমে আসে বলে শোনা যায়, তার বেশিরভাগটাই গল্প।"

"আমরা—" আমি বললাম, "আমরাও ওসব বিশ্বাস করতে পারি না কুমারসাহেব, কিন্তু একেবারে গল্প বলে উড়িয়ে দিতেও পারি না এটা। বিশেষ করে এই ঘটনার পর। আমার বড়দা মিথ্যে কথা লেখার মানুষ নয়।"

"না, না— তা নয়। তুমি হয়তো অবাক-অবাক ঘটনার কথা অনেক পড়েছ। আমি সামান্য পড়েছি। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় একসময়— সালটা বোধ হয় সিক্সটি সিক্স কি সিক্সটি সেভেন হবে, ঝাঁকে-ঝাঁকে অদ্ভুত জিনিস দেখা যেত। হিউজ ফিগার— সাত ফুট মতন লম্বা, রেড আইজ, জাইগেনটিক উইংস—ফোল্ডেড। তা এসব দৃশ্য দেখার পর গবেষণাও অনেক হয়েছিল— কিছুই ধরা পড়েনি। আগুনে গোলা, নীল মতন দেখতে, ছাতার মতন একরকম ইউ. এফ. ও., সসার— এরকম কত কিসের কথা শোনা যায়। প্রমাণ কিছু হয়নি। তার মানে আমি বলছি না, তোমার দাদা মিথ্যে-মিথ্যে কথাগুলো লিখেছেন। আমি বলছি, তাঁর শোনার ভুল হতে পারে। চোখের ভুলও।"

"চোখের ভুল?"

কুমারসাহেব হাসলেন, "হ্যাঁ, চোখের ভুলটাই বেশিরভাগ সময় হয়। নেচার মিসলিড্‌স আস।"

"তা কেমন করে হবে?"

"হয়।... তোমাদের বয়েস কম— এখন বুঝবে না; পরে দেখবে— চোখ অনেক সময় ভুল করে, মনও ভুল করে। কিছু রিড্‌ল থেকে যায় ভাই। মিরার বা আয়নার কথাই ধরো। আয়নায় আমরা রিভার্স দেখি। কিন্তু মাথা বা পায়ের বেলায় তো

সেটা উলটে যায় না। মাথা ওপরেই থাকে। পা নিচে। যাক গে, কাল আমরা ওই জায়গাটায় যাব। ওটা মন্দারগড় হোক, বা মানিদাগড় যাই হোক, যাব। দেখব সেখানে কী রহস্য আছে!"

পরের দিন বিকেলের গোড়ায় গিরিলালের ধর্মশালায় পৌঁছে গেল কুমারসাহেবের ট্রেকার।

গাড়িতে আমরা চারজন। কুমারসাহেব, তাঁর ড্রাইভার, আনন্দ আর আমি।

পাঁড়েজি ট্রেকার গাড়ি দেখে কেমন থতমত খেয়ে গেল।

কুমারসাহেব দু-তিনটে ঘরের ব্যবস্থা করে নিলেন পাঁড়েজির সঙ্গে।

পাঁড়েজির লোক লালা ঘরদোর পরিষ্কার করে দড়ির খাটিয়া বিছিয়ে দিল।

বিকেলে আমাদের চা খাওয়া হল— কুমারসাহেবের ব্যবস্থা।

সন্ধে হয়নি তখনও।

কুমারসাহেব বললেন, "চলো।"

সারাদিন পরে বিকেল থেকে সামান্য মেঘলা হয়েছিল। বৃষ্টি হবে বলে অবশ্য মনে হয়নি।

ট্রেকারের মধ্যে আমাদের নানান সরঞ্জাম। কুমারসাহেবের ব্যবস্থা সব। খাবার-দাবার থেকে বিশ্রাম নেওয়ার গদি বালিশ। বড়-বড় টর্চ। মায় একটা স্পট লাইট। নেহাত আগেভাগে জানতেন না কুমারসাহেব, নয়তো তিনি তাঁর বন্দুকটাও নিয়ে নিতেন। সেটা তো আর সঙ্গে আনেননি কটোরাঘাট আসার সময়। অবশ্য আমাদের আনন্দের কাছে একটা পাহাড়ি গুপ্তি আছে।

ট্রেকার চলতে শুরু করল।

কুমারসাহেব পথ বলে দিচ্ছিলেন।

পাহাড়-জঙ্গল জায়গা, এখানে পথ বলে কিছু নেই, আন্দাজে এগিয়ে চলা। যেতে-যেতে অন্ধকার হয়ে এল।

অন্ধকারের মধ্যেও চোখে পড়ছিল— দূরে কোথাও যেন কালো মেঘের মতন ভাঙাচোরা কী দেখা যাচ্ছে। কুমারসাহেব টর্চ ফেলে বললেন, "ওগুলো ভাঙা গড়, পাথরের। কতকাল ধরে পড়ে আছে।"

ঘন জঙ্গলের এক গন্ধ আছে। সামনে গিয়ে না দাঁড়ালে বোঝা যায় না— অনুভব করাও যায় না। তবু এই গন্ধ যেন গাছলতাপাতা আর অন্ধকারের এক বন্য গন্ধ। একটু ভয়-ভয়ও হয়।

ট্রেকার যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। একই পথে বারকয়েক ঘোরাও হয়ে গেল। ঘড়িতে রাত সাড়ে আটটা প্রায়। বৃষ্টিও শুরু হল হঠাৎ।

আচমকা আমাদের ট্রেকার দাঁড়িয়ে গেল।

কুমারসাহেব টর্চ ফেললেন। দেখলেন। বললেন, "ওই দেখো।"

দেখলাম— লোহার বড়-বড় অ্যাঙ্গেলের মধ্য দিয়ে তারকাঁটা ঢুকিয়ে সামনে এক বিরাট বাধা দাঁড় করানো আছে। সোজা কথায়—তারকাঁটার ফেন্সিং।

কুমারসাহেব গাড়ির জোরালো স্পট লাইট জ্বেলে দিলেন।

বোঝা গেল, ফেন্সিংয়ের ওপারে যাওয়া চলবে না, ওটা প্রোটেক্টেড এরিয়া।

কুমারসাহেব বৃষ্টির মধ্যেই আলো ফেলে-ফেলে দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন, "এ দেখছি ভয়ঙ্কর অবস্থা। প্রথমে কাঁটাতার, তারপর কংক্রিটের থাম, তারপর খাদ— ডিচ— শেষে

ওয়াচ টাওয়ার। তারপর যে কী, দেখতে পাচ্ছি না। এখানে এরকম একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মতন জায়গা আছে জানতাম না তো ! আশ্চর্য ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ !”

আমাদের ট্রেকার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। ঘন জঙ্গল, বড়-বড় গাছ। লতাপাতায় সামনের দিকটা আড়াল পড়ে গিয়েছে। আশপাশেরও একই অবস্থা। বৃষ্টিও পড়ে যাচ্ছিল সমানে। সমস্ত পরিবেশটাই কেমন ভীতিকর।

গাড়ির হেডলাইট মাঝে-মাঝে জ্বালানো হচ্ছিল। আবার নিভিয়ে ফেলাও হচ্ছে ; অকারণে ব্যাটারি নষ্ট করে লাভ কী ?

খানিকক্ষণ পর কুমারসাহেবের কথা মতন আমাদের গাড়ি আরও তিরিশ-চল্লিশ গজ এগিয়ে গেল। গড়িয়ে গেলও বলা যায়— কেননা সামনের দিকটায় ঢাল রয়েছে।

আর যাওয়া গেল না। বিশ-পঁচিশ হাত তফাত থেকে খাদ নেমেছে যেন। ড্রাইভার বলল, গড়াই।

তারকাঁটার গা ধরে-ধরে পাশ দিয়ে এতক্ষণ আমাদের গাড়ি এগিয়েছে। আর উপায় নেই এগোবার। তারকাঁটার সেই বিশাল ফেন্সিং কিন্তু ওই খাদের মধ্যে কেমন নেমে গিয়েছে।

দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই। গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বললেন কুমারসাহেব। “আজ আর ঘোরাঘুরির চেষ্টা করে লাভ নেই। চলো, ফিরে যাই। কাল দিনের বেলায় আসা যাবে।”

“দিনের বেলায় ?” আমি বললাম।

“দিন ছাড়া উপায় কী ? এই প্রোটেকটেড এরিয়ার খোঁজখবর

তো আগে নিতে হবে ; তারপর অন্য কথা।"

গাড়ি ফিরে চলল।

আমি বললাম, "কুমারসাহেব, আমার খুব অবাক লাগছে। বড়দা তার লেখার মধ্যে কোথাও এই প্রোটেকটেড এরিয়ার কথা লেখেনি।"

আনন্দ বলল, "আমিও তাই ভাবছি।"

কুমারসাহেব মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ— তিনিও সেটা ভাবছেন। পরে বললেন, "জায়গার গোলমাল হয়েছে, বলছ ? আমরা অন্য জায়গায় এসে পড়েছি ?"

"কী জানি !"

"না, অন্য জায়গায় এলেও কাছাকাছি, আশেপাশে এসেছি যে তা ঠিকই।"

"কেমন করে বুঝলেন ?"

"এই জঙ্গলের মধ্যে এগোবার আর কোনও রাস্তা দেখিনি।"

আনন্দ বলল, "তাও ঠিক।"

সামান্য চুপচাপ থাকার পর কুমারসাহেব বললেন, "আমি ওই প্রোটেকটেড এরিয়ার কথা ভাবছি। এ-রকম তিন দফা বেরিয়ার আর কোথাও দেখিনি বাবা।...হ্যাঁ, দেখেছি যুদ্ধের ছবিতে। আমাদের কলেজ লাইফে খুব যুদ্ধের ছবি আসত। কলকাতার কথা বলছি। যুদ্ধ শেষ কিন্তু বিদেশের বাজারে তখন বহুত ওয়ার-পিকচার্স জমে গিয়েছিল। বেশির ভাগই প্রোপাগ্যাণ্ডা পিকচার্স। পয়সা কামাতে তার কিছু-কিছু পাঠিয়ে দিত এখানে। সেই ছবিতে হিটলারের নাজীদের তৈরি কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্পের চেহারা দেখেছি। ভয়ঙ্কর জিনিস !"

বৃষ্টির ছাট আসছিল। জোরেই বৃষ্টি হচ্ছে। গাড়ির এঞ্জিনের শব্দও যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বৃষ্টির শব্দে।

আনন্দ বলল, "এখানে তো সেরকম কিছু থাকার কথা নয়।"

"না, কথা নয়। তবে আমাদের এখানে গত যুদ্ধের সময় বেশ কয়েকটা প্রিজনারস্ ক্যাম্প ছিল। মানে 'প্রিজনারস্ অব ওয়ার'-দের রাখা হয়েছে।"

"যুদ্ধবন্দী শিবির!"

"হ্যাঁ।...এদিকেও একটা ছিল। জায়গাটার নাম মনে পড়ছে না— লেট মি থিংক। বেণীপাহাড়, বিঠলগাঁও? না, না। রোহিতগড়, হাতড়া! না। তা নয়। মান-মানজি-মানডি। মনে পড়েছে— নামটা বোধ হয় মানডিগড় ছিল। ইন ফ্যাক্ট জায়গাটা একেবারে বিহার বর্ডারের গায়ে।"

"ক্যাম্প ছিল এখানে?"

"ইয়েস। ছিল।"

"তবে যে বলছিলেন এখানে ব্রিটিশ আর্মির লুকনো অ্যামিউনিশান ডিপো ছিল একটা।"

"দুটোই ঠিক। দুটোই হতে পারে।"

"মানে?"

"মানে এখানকার পুরো এরিয়াটা কত— আমরা জানি না। এখানকার ন্যাচারাল অ্যাড্‌ভানটেজ কী কী তাও জানি না। মানে জঙ্গল, পাহাড়, নদী— কোথায় কী রকম তার কোনও আইডিয়াই আমাদের নেই। আমার মনে হয়, গোটা এলাকার একটা দিকে ছিল বন্দি শিবির, অন্য দিকে অ্যামিউনিশানের ছোট কোনও ডিপো।"

আনন্দ হঠাৎ বলল, "কুমারসাহেব, এমন তো হতে পারে আসলে এটা বন্দিশিবির ছিল, সেটা যাতে বাইরে জানাজানি না হয় তার জন্যে বানিয়ে বলা হত অ্যামিউনিশান ডিপো!"

কুমারসাহেব মাথা নাড়লেন।

আমি বললাম, "আপনি কখনও যুদ্ধবন্দি দেখেছেন ?"

"না," মাথা নাড়লেন কুমারসাহেব। পরে বললেন, "তবে একবার গয়া স্টেশনে আমাদের ট্রেন আটকে একটা স্পেশ্যাল ট্রেন পাস করাতে দেখেছি। একেবারে মিলিটারি পাহারায়। শুনেছিলাম ওই গাড়িতে পি ও ডবলু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

"এখানে কাদের রাখা হত ?"

"ইতালিয়ান আর জার্মান। ইতালিয়ান বেশি।...আফ্রিকার যুদ্ধে ব্রিটিশ তো প্রথমে গোহারা হারছিল। রুমেল তখন যুদ্ধ চালাচ্ছে আফ্রিকায়। তারপর দিন পালটাল। এরা আস্তে আস্তে জিততে লাগল। তখন অনেক ইতালিয়ান ধরা পড়ল। বন্দি হল। তাদের কিছু ধরে এনে এ দেশের ক্যাম্পে রাখা হল। সঙ্গে কিছু জার্মানও।...অবশ্য এ সব তো শোনা কথা, চোখে কোনও ক্যাম্প আমি দেখিনি।"

আমাদের ড্রাইভার পাকা লোক। রাস্তা চিনতে তার ভুল হল না। ধর্মশালার কাছাকাছি এসে পড়লাম আমরা।

কুমারসাহেব হঠাৎ বললেন, "আরে, আরে— একটা কথা তো মাথায় আসেনি !"

"কী কথা ?"

"পরে বলছি, আগে ধর্মশালায় ফিরি।"

আমি বললাম, "সে যাই হোক, একটা কথা আপনি আমায় বলুন ! যুদ্ধ কবে শেষ হয়ে গিয়েছে—পঞ্চাশ বছর হতে চলল। কবেকার সেই ক্যাম্প এখন মিনিংলেস। আমরা স্বাধীন দেশ। পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই ক্যাম্প এখনও থাকবে কেন ? আমরা তো যুদ্ধবন্দি ভরে রাখি না।"

কুমারসাহেব বললেন, "না, সেই প্রিজনার্স ক্যাম্প নেই, কেনই বা থাকবে ! তবে সে অবস্থায় ওটা হাতে পাওয়া গিয়েছিল—

আমাদের সরকার বা মিলিটারি সেখানে নতুন করে কিছু করছে কি না— তা তো আমরা জানি না। হতে পারে সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে ওখানে কিছু করা হয়। হয়তো তাই জায়গাটা প্রোটেকটেড এরিয়া।"

ধর্মশালায় ফিরে এলাম আমরা।

বৃষ্টি তখনও পড়ছে।

মাথা বাঁচিয়ে যে যার ঘরের দিকে ছুটলাম।

তিনটে ঘর আমাদের। কুমারসাহেব একটা ঘর নিয়েছেন। একটা ঘরে আমি আর আনন্দ। অন্য ঘরে কুমারসাহেবের ড্রাইভার আর বেয়ারা।

মোমবাতির আলো জ্বলছিল আমাদের ঘরে। পোশাক-টোশাক বদলানো হয়ে গিয়েছিল আমাদের।

কুমারসাহেব এলেন। মুখে পাইপ।

এসে আমাদের খাটিয়ায় বসলেন। বললেন, "মাথায় একটা কথা চক্কর দিচ্ছিল। বলতে এলাম।"

"বলুন।"

"প্রিজনার্স ক্যাম্প আর অ্যামিউনিশান ডিপো— যত ছোটই হোক, পাশাপাশি থাকতে পারে কি না— সেটাই প্রশ্ন! মনে হচ্ছে পারে। কেন পারে জানো?"

"কেন?"

"তুমি যদি যুদ্ধের সময় বন্দি হয়ে শত্রুপক্ষের হাতে গিয়ে পড়ো— তবে ওরা তোমায় দিয়ে খাটিয়ে নিতে পারে। পারে মানে যা খুশি করাতে পারে না, আইন মাফিক যা করানো যায় করাতে পারে।...কিন্তু একটা বইয়ে পড়েছিলাম— জার্মানরা যুদ্ধবন্দিদের দিয়ে জোর করে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কাজকর্ম করাত। এমন কাজ যাতে তোমার পক্ষে বেঁচে থাকার আশা কম। একে

বলত ডেনজারাস মিশন। সোজা কথায়— তুমি মরো ক্ষতি নেই, আমি আমার কাজটি উদ্ধারের চেষ্টা করব।"

"এ তো একরকম হত্যাই।..."

"হ্যাঁ।"

"তা এখানে—"

"এখানেও যদি এমন হয়— ! কে বলতে পারে ব্রিটিশরা যাদের বন্দি করে রেখেছিল তাদের কাউকে-কাউকে গোলাবারুদের সঙ্গে কোনও ঝুঁকির কাজে পাঠিয়ে দিত কিনা !

আনন্দ চুপ করে থাকল।

আমি বললাম, "কিন্তু এর সঙ্গে বড়দার সেই অদ্ভুত রহস্যময় জ্যোৎস্না..."

"কোনও সম্পর্ক নেই। আবার থাকতেও পারে কোনও সম্পর্ক। এখন কিছুই বলা যায় না।"

কুমারসাহেব মানুষটি আমাদের চেয়েও যেন বেশি উদ্যোগী। সকাল হতে না হতেই সাজো-সাজো রব তুললেন। আমরাও তৈরি হতে লাগলাম।

গিরিলাল ধর্মশালার পাঁড়েজিও আমাদের উদ্যোগ আয়োজন দেখে খানিকটা ঘাবড়ে গেল। ট্রেকার গাড়ি, কুমারসাহেব, ড্রাইভার, বেয়ারা— তার ওপর আমরা দুই বাঙালি ছোকরা — এতরকম যোগাযোগ দেখে তার ঘাবড়ে যাওয়ারই কথা। সে বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা কী হচ্ছে।

সকালে আর বৃষ্টি নেই। রোদও উঠে গিয়েছিল। মাঠ, মাটি অবশ্য ভিজে ছিল তখনও।

কুমারসাহেব বললেন, "চলো। বেলা করলে অসুবিধে হবে।"

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে খাবারদাবার বলতে অল্প হালকা খাবার, আর পানীয় জল। দুপুরের মধ্যে ফিরে আসব আমরা ধর্মশালায়। তারপর ভাত-রুটি-সবজির ব্যবস্থা। আবার বিকেলে বেরুবো।

যাওয়ার সময় এ-কথা সে-কথার মধ্যে কুমারসাহেব বললেন, "কাল আমি বহুত ভেবেছি। ভেবে-ভেবে ঘুম হল না, ফার্স্ট নাইটে। লেট নাইটে আমি টায়ার্ড হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।"

"কী ভাবলেন?" আনন্দ বলল।

"সাম মিস্ট্রি ইজ দেয়ার....ওই মান্‌ডিগড়ে। ইয়েস, জাগয়াটার নাম মান্‌ডিগড়। লোকাল নাম যাই হোক, ইট ইজ্ মান্‌ডিগড়। আমার মনে পড়ল, আমি যখন কলকাতা যাওয়ার আগে একবার নাগপুরে টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়েছিলাম—হকি টুর্নামেন্ট—তখন আমি জাস্ট ইয়াং। সেই সময় এই জায়গায় কোথাও একটা মিটিওরাইট পড়েছিল। কী বলে বাংলায়— ?"

"উল্কাপিণ্ড।"

"পেপারে খবরটা ছাপা হয়েছিল বড়-বড় করে। শুনেছিলাম— মিটিওরাইট্‌টা হেভি ছিল। অত বড় আর হেভি মিটিওরাইট এদিকে কোথাও কোনওদিন পড়েনি। পেপারে খবর ছাপা হতে লাগল। দু-পাঁচদিন পরে, কেউ বলল, ওটা মিটিওর, নট মিটিওরাইট। আরে বাবা, ওই নিয়ে পেপারে ঝগড়া লাগিয়েছিল। ডিফারেন্সটা কী? নো ডিফারেন্স। ওয়ান ইজ বিগার, দি আদার ইজ্ পার্ট অব এ মিটিওর। আমি তো তার বেশি বুঝি না।"

আমি বললাম, "আমরাও বুঝি না কুমারসাহেব, বইয়েতেই পড়েছি— উল্কাপাত।"

আনন্দ বলল, "আমি একটা ছবিতে দেখেছি—আমেরিকায় আরিজোনার কাছে এক জায়গায় বিরাট একটা উল্কাপাত হয়েছিল হাজার-হাজার বছর আগে।"

"ছোটখাটো উল্কা পৃথিবীর সব জায়গাতেই পড়েছে"—আমি বললাম, "এ আর নতুন কথা কী ?"

কুমারসাহেব বললেন, "নতুন কথা ছিল। পেপারে লিখল, মিটিওরটা পড়বার সময় আগুনের গোলার মতন জ্বলছিল, আর শব্দ হচ্ছিল মেঘ ডাকার মতন।"

আমরা কিছু বললাম না। হতেই পারে শব্দ, দাউদাউ করে জ্বলতেও পারে। অত আমরা জানি না।

কুমারসাহেব নিজেই আবার বললেন, "পেপারে তখন জবর হল্লা চলছিল মিটিওর নিয়ে। কেউ-কেউ তখন অন্য থিয়োরি পেশ করতে লাগল। বলল, মিটিওর-টিটিওর নয়, আলাদা কোনও প্ল্যানেট থেকে একটা গোল ডিব্বা— মানে কোনও রাউন্ড অব্জেক্ট এসে পড়েছে। ফ্লাইং অব্জেক্ট।"

আমরা অবাক হয়ে কুমারসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। অন্য গ্রহ থেকে একটা গোল স্পেসশিপ এসে পড়েছিল নাকি ! আশ্চর্য !

আনন্দ বলল, "মানে, সেই উড়ন্ত চাকি বা লাট্টু।"

"আরে বাবা, চাকি, লাট্টু, বেলুন, টর্পেডো-টাইপ বা যাই হোক—কেউ তো চোখে দেখেনি। যার যা খুশি বলতে লাগল।"

"তারপর ?"

"তারপর দু-চার মাস পরে সব চুপচাপ। গপ্‌সপ্ খতম। তবে

একটা কথা ঠিক—গভর্নমেন্ট জায়গাটা ঘিরে রাখল।"

"এটা কখন হয়েছিল?" আমি বললাম।

"আমি তখন ইয়াং। কলেজে বি. এস-সি. পড়ি। তারপর কলকাতায় মেডিকেল পড়তে চলে গেলাম। স্টেট কোটা ছিল তখন।"

"আপনার বয়েস তখন কুড়ি-বাইশ?"

"অফকোর্স টুয়েনটি টু।"

"যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে?"

"আগেই।"

"আচ্ছা সার", আনন্দ বলল, "এমন তো হতে পারে—মিটিওর স্পেসশিপ—কিছুই নয়, একটা এরোপ্লেনে আগুন লেগে গিয়েছিল—সেটাই ওখানে ভেঙে পড়েছিল।"

কুমারসাহেব মাথা নাড়লেন। "না, এরোপ্লেন ভেঙে পড়লে তার খবর থাকত।"

কথায়-কথায় আমরা অনেকটা পথই চলে এসেছি। দিনের আলোয় গাড়ি চালাতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না ড্রাইভারসাহেবের। দারুণ চালায় লোকটা।

কাল রাত্রে এই বনজঙ্গলের পথ বৃষ্টির মধ্যে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। চারপাশে ঘন অন্ধকার যেন কোনও গুহার মতন আমাদের ঘিরে রেখেছিল, গাড়ির হেডলাইটের জোরালো আলো অনবরত লাফাচ্ছিল, বৃষ্টি পড়ছিল, শব্দ হচ্ছিল, গাছ-পাতায় হাওয়া লেগে কেঁপে উঠছিল। ভয় পাওয়ার মতন পরিবেশই। কোথায় যে চলেছি —তাও যেন জানা ছিল না!

আজ সেইরকম অবস্থা নয়। জঙ্গলের পথে কোথাও রোদ, কোথাও ছায়া। গাছপালা কত নরম দেখাচ্ছে। এখনও বৃষ্টির জল শুকিয়ে যায়নি গাছের ডালপালা থেকে। বুনো পাখিও

ডাকছিল মাঝে-মাঝে।

আমি চুপচাপ ছিলাম। অন্যমনস্ক। হঠাৎ মাথায় কেমন অদ্ভুত চিন্তাটা এল। আচ্ছা, এমন যদি হয়—কুমারসাহেব উল্কাপিণ্ডর যে কাহিনী শোনালেন তা যদি না হয়ে সত্যি-সত্যি সে-সময় একটা উড়ন্ত চাকি এসেই থাকে মহাশূন্য থেকে! পারে না? এত যে কথা আমরা শুনি ইউ. এফ. ও.-এর, তার সবই কি গল্প? যদি গল্পই হবে তবে এ নিয়ে এত মাথাব্যথা, গবেষণা কেন? বিদেশে কত বই লেখা হয়ে গিয়েছে এই বিষয় নিয়েই। সবই কি ফাঁকিবাজি! বড়দা নিজে সরল সাদামাঠা মানুষ ছিল ঠিকই, তবে দাদার মতিভ্রম হয়নি। নির্বোধ মানুষ দাদা নয়। আমি আগেই বলেছি, দাদা শিক্ষিত ছিল। এঞ্জিনিয়ারিং পাশ-করা লোক। বোকার মতন যে যা বলবে বিশ্বাস করার পাত্র নয়। তবু সেই দাদাই কেন এইসব উদ্ভট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে, কেনই-বা বিশ্বাস করবে অদ্ভুত-অদ্ভুত ব্যাপারগুলো, তা অবশ্য আমি জানি না। গ্রহান্তরের বস্তু সম্পর্কে বড়দার বিশ্বাস যদি নাই-বা বলি—বলতে পারি কৌতূহল।

আনন্দ আমার গায়ে ঠেলা দিল।

তাকালাম।

"কী ভাবছিস?"

যা ভাবছিলাম বলতে কেমন দ্বিধা হল। সামান্য পরে বললাম, "আচ্ছা, একটা উড়ন্ত কিছু তো আসতেই পারে। পারে না?"

"কী বলিস যে!"

আমি কুমারসাহেবের দিকে তাকালাম। বললাম, "কুমারসাহেব, সেটা কোন সময়ের কথা হবে?"

"কোন্‌টা?"

"পেপারে যখন এই খবর বেরিয়েছিল, আলোচনা হয়েছিল।"

"সালের কথা বলছ! আমি একেবারে ঠিক-ঠিক বলতে পারব না। তবে নিয়ারলি ফরটি ইয়ার্স ব্যাক। চল্লিশ....তা চল্লিশ বছর হবে। ব্রিটিশ জামানায় নয়।"

খানিকটা ইতস্তত করে আমি বললাম, "ধরুন এমন যদি হয়—তখন কোনও গ্রহান্তরের একটা সসার বা গোল ধরনের জাহাজ সত্যিই ওখানে এসে পড়েছিল ছিটকে!"

কুমারসাহেব কিছু বলার আগে আনন্দ হেসে বলল, "তোর মাথায় হঠাৎ এই চিন্তাটা এল কেমন করে!"

"না, বলছি।"

"হঠাৎ এসে পড়বে কেন?"

"কেন পড়বে না! এমন কোনও যন্ত্র কি আছে যা বিগড়োয় না! সে-দিন আমেরিকায় কী হল? এই তো পঁচাশি-ছিয়াশি সালের কথা। কী নাম যেন শাট্‌লটার! চ্যালেঞ্জার কী! একটা অত বড় স্পেস শাট্‌ল— অমন নিখুঁত করে তৈরি, মহাশূন্য যার কাছে জলভাত, আকাশে উঠতে-না-উঠতেই ছাই। এখনকার দিনেও এরকম হয়।"

কুমারসাহেব আমাদের কথা শুনছিলেন। বললেন, "যুক্তি হিসেবে এটা ঠিকই, তবে কী হয়েছিল তা তো আমরা জানি না।...ওই দেখো, আমরা এসে পড়েছি।"

তাকিয়ে দেখি গতকালের সেই জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি প্রায়। কিন্তু কাল রাত্রে অন্ধকার আর বৃষ্টির মধ্যে যা দেখেছিলাম—তা যেন খুবই ঝাপসা।

গাড়ি আরও এগিয়ে গেল।

কুমারসাহেব একজায়গায় গাড়ি থামাতে বললেন। গাড়ি থামল। আমরা নেমে পড়লাম।

কাল আমরা ভুল দেখিনি। তবে এমন স্পষ্ট করে দেখতেও

পারিনি। আজ দেখলাম, তারকাঁটার যে বেড়া সোজা চলে গিয়েছে, গিয়ে ক্রমশ পাতাল-প্রবেশের মতন নিচু হয়ে নেমেছে—সেই তারকাঁটার বেড়ার ধরনটা আলাদা। মাথায় যে বেশ উঁচু, তাতে সন্দেহ নেই। বেড়া দেখে প্রথমেই মনে হয়েছিল লোহার খুঁটির বেড়া। এখন বোঝা গেল— খুঁটিগুলো লোহার, রং-করা, আর খুঁটির গায়ে-গায়ে শালগাছের খোঁটা। চট করে দেখলে বোঝা যায় না যে লোহার খুঁটির গায়ে-গায়ে শালখুঁটিও আছে। কেন ? বেশি পাকাপোক্ত করার জন্য ? না, চোখের ভুল ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য ? খুঁটির পর খানিকটা জমি—জঙ্গুলে জমি—পাথর, ঝোপঝাড়ে ভরতি। তারপর কংক্রিটের থাম। গতকাল যা মামুলি থাম বলে মনে হয়েছিল—এখন দেখা গেল সেগুলো নেহাত কংক্রিট পিলার বা থাম নয়। প্রথমত, একটা থামের সঙ্গে আরেকটা থামের দূরত্ব প্রায় বিশ-পঁচিশ ফুট হলেও থামের তলার দিকটায় মাটি ছুঁয়ে টানা পাঁচিল চলে গিয়েছে অন্য থাম পর্যন্ত। পাঁচিলটা ফুট তিনেকের বেশি উঁচু মনে হয় না, কিন্তু ঢেউখেলানো পাঁচিল। কেন, কে জানে ! এর পর আরও খানিকটা তফাতে ডিচ—মানে বড় নালার মতন খাল। খাল কতটা চওড়া, বোঝা যায় না। তিরিশ-চল্লিশ গজ হতে পারে। খালের ওপারে ওয়াচ-টাওয়ার।

আনন্দ কলকাতা থেকে আসার সময় বায়নাকুলার এনেছিল। সঙ্গেই ছিল আজ।

আমি বায়নাকুলার হাতে নিয়ে আরও একটু দেখার চেষ্টা করলাম। তারপর আনন্দ নিল। দেখল।

শেষে কুমারসাহেব।

কুমারসাহেবের শিকারি চোখ, তা ছাড়া বন-জঙ্গল তাঁর চেনা। তিনি একটু উঁচু জায়গায় গিয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলেন খানিকটা

সময়।

তারপর কাছে এসে অবাক গলায় বললেন, "মাই গড....। তোমরা কিছু দেখোনি ?"

"কী ?"

"আরে, ওদিকে যে হাফ্-রাউন্ড শেপের ক'টা ব্যারাক আছে। ব্যারাকগুলো ক্যামাফ্লুয়েজ করা, একেবারে মিলিটারি কায়দায়। গ্রিন আর খাকি রঙে লেপটে রেখেছে। তার পাশে-পাশে আবার দু-একটা করে বড়-বড় গাছ। নিমটিম হতে পারে।"

আমরা সত্যিই অতটা খেয়াল করিনি। কিংবা বুঝিনি।

কুমারসাহেব আনন্দর দিকে তাকালেন। বললেন, "আনন্দ, এখানে কোনও মিলিটারি ব্যারাক আছে। শিওর।"

"মানে ?"

"মিলিটারি ! আবার মানে কী— !"

"মিলিটারি দেখলেন ?"

"না। বায়নাকুলার হাতে দাঁড়িয়ে থাকলে শিওর দেখা যাবে।"

আমরা বললাম, "তা হলে ?"

"চলো, আরও একটু এগিয়ে যাই।"

গাড়ি নিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে দেখা গেল— সামনে গাড়ি যাওয়ার পথ নেই। একেবারে খাদের মতন নিচু হয়ে নেমে গিয়েছে ঘন জঙ্গল। ওই জঙ্গলের মধ্যেও ফেন্সিংয়ের কিছু দেখা যায়—বাকি দেখা যায় না, আড়াল পড়ে গিয়েছে। তার ওপারে পাহাড়ের মাথা। একটানা। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। পাহাড়ের মাথায় আকাশ নেমেছে যেন।

কুমারসাহেব নিজের মনেই মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "এই দিক দিয়ে ভেতরে যাওয়ার কোনও উপায়ই নেই।"

"তা হলে ?"

"অন্য দিক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ওই পাহাড়ের দিক দিয়ে। নিশ্চয় পথ আছে।" বলে কী ভাবলেন যেন, বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, আমরা ভুল রাস্তায় এসেছি। এখান দিয়ে মান্‌ডিগড়ে যাওয়া যায় না। অন্য রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে। একেবারে উলটো দিক থেকে।"

হঠাৎ আমার মনে হল, বড়দাকে কি মিলিটারিরা ধরে ফেলে গুলি করে মেরে ফেলেছে ? কিন্তু কেন ?

কথাটা কেন মনে হল, কে জানে !

বিকেল ফুরোতেই আবার তোড়জোড় শুরু হল।

কুমারসাহেবের ড্রাইভার পাকা লোক। আমরা নজর করে দেখেছি, গাড়ি নিয়ে বেরোবার অনেক আগে থেকেই ড্রাইভারজি গাড়িটার তদারকি সেরে নেয় ভাল করে। এঞ্জিন দেখে, তেলকালি মুছে নেয়, ব্যাটারি পরখ করে, দেখে রেডিয়েটরের জল। তেল তো অবশ্যই দেখা দরকার। চাকার হাওয়া ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নেয়।

ড্রাইভারজি হল ছত্রিশগড়ের লোক। দেখতে গাঁট্টাগোট্টা। মুখের আদল অনেকটা বর্মিদের মতন। কেমন যেন চ্যাপটা-চ্যাপটা। ভাঙা বসা নাক, চোখ দুটি গোল-গোল। ওর নাম, আখলা।

আখলা বলল, গাড়ির তেল কম রয়েছে। বিশ-পঁচিশ মাইলের

বেশি ঘোরাফেরা করা যাবে না। বড় ক্যান করে যে তেল আনা হয়েছিল তা শেষ। আবার তেল আসবে ক্যানে, আসবে বাসে— ত্রিবেদীজি পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন— বাসস্টপে গিয়ে সেই তেল নামিয়ে আনতে হবে। এসব আগামীকালের কথা, আজ যতটা তেল আছে তাতেই কাজ চালাতে হবে।

কুমারসাহেব বললেন, "অলরাইট, আমরা আজ দশ-বারো মাইলের মধ্যেই রাউন্ড মারব। রাস্তা একই। খুব নজর করে দেখব— কোনও শর্ট ওয়ে আছে কি না!"

"মানে?"

"জঙ্গলের গাছ, ঝোপঝাড় অনেক সময় অন্য রাস্তা আড়াল করে রাখে, তাই না কুমারসাহেব?" আনন্দ বলল।

মাথা নাড়লেন কুমারসাহেব, হেসে বললেন, "জঙ্গল বড় ভুলভুলাইয়া জায়গা!" বলেই অন্য কথায় চলে গেলেন। কাল, তেলের নতুন ক্যান আসার পর গাড়িতে তেল ভরে তিনি একেবারে পুরো চক্কর মেরে পাহাড়ের ওপাশ দিয়ে মিলিটারি-মার্কা ওই ছাউনির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। তাঁর ধারণা, এইদিক দিয়ে— মানে পুবের দিক দিয়ে ওই ক্যাম্পে যাওয়া যাবে না। পশ্চিম দিয়ে যাওয়া যাবে। আর যাই হোক, ক্যাম্পের লোকদের জন্য আসা-যাওয়ার রাস্তা তো নিশ্চয় আছে। এমন তো হতে পারে না যে, ওখানকার লোকগুলোকে একেবারে আইসোলেট করে রাখা হয়েছে। অসম্ভব!

আমি বললাম, "কিন্তু এমন যদি হয়— স্থলপথে কোনও যোগাযোগ রাখা হয়নি।"

কুমারসাহেব হেসে উঠলেন, "হয় না, তা হয় না। ওটা কোনও দ্বীপ নয়।"

আমাদের বেরোতে-বেরোতে বিকেল শেষ হয়ে এল। তবে

আলো তখনও ফুরিয়ে যায়নি। আজ কোনও তাড়াহুড়ো নেই। বেশি দূর তো আমরা যাব না। উপায় নেই। তবে আমার মনে হল, যে-কাজের জন্য আমরা যাচ্ছি, অন্ধকার হয়ে গেলে সে-কাজ হবে কেমন করে! বনজঙ্গলের ভেতরটাকে কুমারসাহেব বলেছেন ভুলভুলাইয়া। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু ওই বনজঙ্গলের মধ্যে— গাছপালা, ঝোপঝাড়ে আড়ালে যদি কোনও চোরা পথ বা শর্টকাট রাস্তা থেকেই থাকে— তবে আমরা অন্ধকার হয়ে গেলে দেখতে পাব কেমন করে? হ্যাঁ, আমাদের কাছে জোরালো টর্চ আছে, আছে গাড়িতে স্পট লাইট। তা থাকুক, দিন-দুপুরের আলোয় গাড়িতে যেতে-যেতে যেভাবে চারপাশ নজর করা সম্ভব, অন্ধকার হয়ে গেলে সেটা সম্ভব নয়। কুমারসাহেব যে এসব বোঝেন না তা নয়, তবু তিনি যখন বলছেন— বেরনো গেল।

অন্যদিকে গাড়ি যে-পথে যায় সেই পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে— সিকি মাইল কি আধ মাইল— গাড়ি থেমে গেল। কুমারসাহেব থামাতে বললেন। তখনও ফিকে আলো ছিল।

গাড়িতে বসেই সামনে বাঁ দিকে তাকালেন কুমারসাহেব। পাঁচ-সাতটা বড়-বড় গাছ গায়ে-গায়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে ঝোপ। গাছগুলোর মধ্যে নিম আর অশ্বত্থগাছ আমি চিনতে পারলাম— বাকি পারলাম না।

কুমারসাহেব কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে ড্রাইভার আখলাকে নেমে গিয়ে দেখতে বললেন কী যেন।

আখলা নেমে গেল।

আনন্দ জিজ্ঞেস করল, "কী দেখতে পাঠালেন, সার?"

কুমারসাহেব বললেন, "কাপড়া পড়ে আছে ওখানে! কিসের কাপড়া?"

আখলা ঘোরাফেরা করে ফিরে এল। বলল, "ছেঁড়া গামছার

একটা টুকরো পড়ে আছে। মিট্টি লাগানো।"

কুমারসাহেব নিজে নেমে গেলেন। একটা কাঠি কুড়িয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন জিনিসটা। ফিরে এসে বললেন, "গামছার টুকরোই। লাল রঙের। মাটিতে জলে রোদ্দুরে বোঝার উপায় নেই আর রং। কোনও দেহাতি লোকের গামছা হবে। এই পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করেছে কখনও।"

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল।

চলতে-চলতে এক জায়গায় বড়-বড় পাথর চোখে পড়ল। বিরাট-বিরাট পাথরের চাঁই। পাথরগুলো এলোমেলো পড়ে

আছে। যেন এখানে একটা পুচকে পাহাড় তৈরি হয়ে উঠছিল কোনও সময়ে। পাথরগুলো এমনভাবে সাজানো যে, একটার পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়— গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না।

কুমারসাহেব আমাদের নামতে বললেন।

নামলাম আমরা।

পাথরগুলোর কাছাকাছি গিয়ে আনন্দ বলল, "এগুলো কী পাথর ? এত কালো ?"

কুমারসাহেব বললেন, "বর্ষাকালে জলে ধুয়ে-ধুয়ে ওই রকম দেখাচ্ছে। ধুলোময়লা নেই। সাফসুফ।"

দুটো বড়-বড় পাথরের তলা দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম সামান্য। পায়ের তলায় ছোট-ছোট পাথর, পাথর টপকে-টপকে এগোতে হচ্ছিল। কোথাও-কোথাও ঘাস গজিয়েছে, কোথাও বা কাঁটাঝোপ। বড় দুই পাথরের মাঝপথ দিয়ে এপারে এসে দেখি সামনে যেন বিশাল মাঠ। অবশ্য পাথরে-পাথরে ভরতি। পাহাড়ের নিচে যেমন হয়, অনেকটা সেইরকম। ওরই মধ্যে চোখে পড়ল, একটা মাথাভাঙা গম্বুজ মতন কী দাঁড়িয়ে আছে।

মন্দির নাকি!

আনন্দ নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করেছে, দেখেছে অনেক কিছু। সে বলল, "মন্দির নয়, ভাঙা রথ।"

"রথ!"

"নিচে দুটো চাকা দেখছিস না!"

"পাথরের চাকা। এখানে কোনও সময়ে নিশ্চয় কোনও যুদ্ধটুদ্ধ হয়েছিল।"

"এই পাথুরে জায়গায় যুদ্ধ!"

"রথ দেখে তাই মনে হচ্ছে। কোন বইয়ে যেন পড়েছি, আগেকার দিনে কোনও-কোনও রাজারাজড়া যুদ্ধে জিতলেই একটা রথ বানিয়ে রেখে যেতেন। যুদ্ধজয়ের চিহ্ন। বিজয়রথ রে ভাই!" বলে আনন্দ হাসল।

কুমারসাহেব বললেন, "না, না, আনন্দ। যুদ্ধ নাও হতে পারে। দু-তিনশো বছর আগেকার কোনও মঠ-মন্দির হতে পারে। পাহাড়ের তলায় পাথর জোটানো সহজ, কাজেই পাথরের তৈরি মঠ-মন্দির গড়ে উঠত।"

আমরা আরও একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। প্রায় যেন

চোখের পলকে আলো মরে গেল। অন্ধকার।

দূরে পাহাড়ের ঢাল চলে গিয়েছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ওধারে অন্ধকার।

কুমারসাহেব বললেন, "চলো, ফেরা যাক।"

টর্চ আমাদের সঙ্গেই ছিল। ফিরে এলাম সাবধানে।

গাড়ির কাছে পৌঁছে দেখি, কখন যে সন্ধে নেমে গেছে বুঝতেই পারিনি। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে।

গাড়ি নিয়ে ফেরাই উচিত ছিল। কুমারসাহেবের খেয়াল হল, আরও একটু এগিয়ে তবে ফিরবেন।

এই সময় বাতাস উঠল। ঝোড়ো বাতাস নয়, আমাদের বাংলাদেশে শরৎকালের সন্ধের বাতাসও নয়। এই বাতাস কেমন গা শিরশির করানো। অনেকটা হেমন্তকালের মতন। হেমন্তকালের মতনই হালকা কুয়াশাও যেন গাছপালার ডালে-পাতায় ঝোপে-ঝাড়ে জমে উঠছিল।

আমরা ফিরেই আসছিলাম, হঠাৎ এক শব্দ কানে গেল।

আনন্দই প্রথমে খেয়াল করেছিল। "কিসের শব্দ না?"

আমরা কান পাতলাম।

সত্যিই একটা শব্দ। মাটিতে নয়, আশেপাশে নয়, আকাশে।

আকাশের কোনও কোণ থেকে শব্দটা আসছিল।

"এরোপ্লেন?"

"কই, কোথায়?"

প্লেন হলে কি অনেক দূরে আছে? এত মৃদু শব্দ!

আকাশে তারা ফুটে উঠতে শুরু করেছিল।

কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, "প্লেনের তলায় তো দুটো আলো থাকে দেখেছি, লাল আর সবুজ, মিটমিট করে জ্বলে, তারার মতন। আলো কই?"

আলোর কোনও চিহ্ন নেই। শুধু তারাই চোখে পড়ে আকাশে।

শব্দটা সামান্য জোর হল। হলেও প্লেনের মতন নয়। ওই শব্দ শুনলে মনে হবে মাথার ওপর ভোমরা উড়ছে যেন।

আশ্চর্য!

কুমারসাহেব তাকিয়ে থাকলেন আকাশের দিকে। আনন্দ বোকার মতন টর্চ ফেলল শূন্যে।

আমার যে কী মনে হচ্ছিল কে জানে!

আনন্দ বলল, "কৃপা, এখন কৃষ্ণপক্ষ না?"

"হ্যাঁ!" আমি বললাম। কৃষ্ণপক্ষের মধ্যেই আমরা কলকাতা ছেড়ে বেরিয়েছিলাম। পাঁজিপুঁথি পরে আর দেখিনি।

আমার হিসেবে এখন হয় চতুর্দশী বা অমাবস্যা। ত্রয়োদশী হতে পারে। চতুর্দশী বলেই মনে হল।

কুমারসাহেব আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বললেন, "শব্দটা পাহাড়ের দিকে।"

"মানডিগড়ের দিকে?"

"হ্যাঁ, ওইদিকেই।"

"কিসের শব্দ?"

"প্লেনের। শুনেছি যুদ্ধের সময় এইরকম চুপচাপ জাপানি প্লেন আসত বহুত উঁচু দিয়ে আমাদের বর্ডার এরিয়ায়।"

"এ তো আর জাপানি প্লেন নয়!"

"না।"

"তবে?"

কুমারসাহেব সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "আমাদের প্লেন। মাস্ট বী আওয়ার প্লেন। ওই মিলিটারি বেস্‌টায় আসছে।"

"মানডিগড়ে !"

"শিওর।"

"আলো নেই কেন ?"

"কী জানি !"

"এ যেন সার, লুকিয়ে চুপিচুপি আসা !"

"হ্যাঁ।"

"নামবে কেমন করে ?"

"নিচে— মাটিতে কোনও আলো দেওয়া আছে নামার জন্যে। আমরা দেখতে পাচ্ছি না।"

কথাবার্তার মধ্যেই আচমকা আমাদের চোখে পড়ল— মিহি একটা আলো— আবছা জ্যোৎস্নার মতন পাহাড়ের ওপাশে যেন ফুটে উঠল। ওই আলো দেখলে মনে হবে, বৃষ্টির জলকণায় ভেজা একেবারে নরম ধোয়া-ধোয়া চাঁদের আলো।

আমার কেমন গা ছমছম করে উঠছিল। উত্তেজনাও বোধ করছিলাম হয়তো।

শব্দটা ক্রমশ কমে আসতে লাগল।

আমরা উৎকর্ণ হয়ে থাকলাম।

এক সময় সবই নিস্তব্ধ। শুধু ঝিঁঝি ডাকছিল গাছপালার আড়ালে।

পরের দিন খানিকটা বেলায় একটা লরি এসে থামল ধর্মশালায়। পাঁড়েজি হাঁকডাক শুরু করল লরি দেখে। ধর্মশালা

মেরামতির মালপত্র এসেছে এক খেপ। মিস্ত্রি-মজুর আসেনি। পরে আসবে। অন্য লরিতে আরও মাল আসার সময়।

লরিঅলার সঙ্গে লোক ছিল একজন, খালাসির মতন। পাঁড়েজি, লালা, ড্রাইভার আর খালাসি মিলে মালপত্র নামাতে লাগল। দেখলাম, অ্যাসবেসটাস শিট নামল গোটা দশেক, লোহার অ্যাংগল গোটা পাঁচেক, কাঠকুটো সামান্য, ফেন্সিংয়ের মামুলি তার, কয়েক বস্তা সিমেন্ট।

আমাদের অবশ্য লরি নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও দরকার ছিল না।

কুমারসাহেব আজ সকাল থেকেই বড় অস্থির হয়ে পড়েছেন। কালকের ঘটনার পর থেকেই তিনি উত্তেজিত। আজ যেন তিনি আরও উত্তেজিত, অস্থির।

আখলা গেল গাড়ি নিয়ে সেই বাস রাস্তার মোড়ে, তেলের বড় ক্যান আনতে। একটা ক্যানের তেল সে গাড়িতে ঢেলে নিয়ে ফাঁকা ক্যানটা আবার বাসে চাপিয়ে দেবে। ছোট একটা ক্যান গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে ফিরে আসবে। বলা যায় না, কখন পথেঘাটে তেল ফুরিয়ে যায়! কুমারসাহেব এসব ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানী। ব্যবস্থা পাকা করেই এসেছেন আগে।

হঠাৎ দেখি কুমারসাহেব লরি ড্রাইভারের সঙ্গে গাছতলায় দাঁড়িয়ে কী কথাবার্তা বলছেন!

আনন্দ আর আমি— আমরাও কালকের ঘটনার পর রীতিমতন চঞ্চল হয়ে পড়েছি। কী যে ঘটল কাল, যা দেখলাম তা সত্যি, না, চোখের ভুল, না কি আমাদেরই ভ্রম— তা যেন সারা রাতই ভেবেছি। চোখের ভুল যে নয়— তা তো ঠিকই। একজনের ভুল হতে পারে— বাকিদের হয় কেমন করে!

আনন্দ এই ক'দিন হাসিঠাট্টা করে বলত, "দ্যাখ কৃপা— ওই

মহাশূন্য থেকে দু-চারটে চাকতি উড়তে-উড়তে পৃথিবীতে চলে এল— এই গ্যাঞ্জাসটা ওদেশেই প্রথম আমদানি হয়েছে। আমরা বাবা ওতে ছিলাম না।"

আনন্দ ঠাট্টা করে গাঁজাখুরিকে 'গ্যাঞ্জাস' বলত। খুবই অবাক ব্যাপার, কালকের ঘটনার পর সে আর হাসি-তামাশা করছে না। কেমন যেন জব্দ হয়ে গিয়েছে।

কুমারসাহেবও বলতে পারছেন না, কালকের ঘটনাটা কী হতে পারে! অনুমান করছেন, রহস্য নিশ্চয় কিছু আছে। সেই রহস্য বড়দার কথামতন কতটা যথার্থ, তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

বেলা বাড়তে লাগল।

আখলা ড্রাইভার সময় মতন চলে গিয়েছিল তেলের ক্যান আনতে। ফিরেও এল।

কুমারসাহেব বললেন, "আমরা বিকেলের গোড়াতেই বেরিয়ে পড়ব। আজ আমাদের অন্য পথে যেতে হবে।"

লরি ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে কুমারসাহেব এদিকের পথঘাটের খবরও কিছু নিয়ে নিয়েছিলেন।

বিকেলের শুরুতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

আজ আমরা নানান ব্যবস্থা করে বেরিয়েছি। ধরেই নিয়েছি, অনেকটা রাস্তা যেতে হবে, ঘুরতে হবে, সন্ধে তো হয়ে যাবেই, রাতও হতে পারে, আবার বলা যায় না, মাঝরাত পর্যন্ত হয়তো আমাদের বনে-জঙ্গলে কাটাতে হল।

পোশাক-আশাক যেমনই হোক, অন্য ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই। খাবার-দাবার, জল, আলো, নেহাত বিপদে পড়লে ব্যবহার করা যায় এমন দু-একটি লাঠি, আনন্দর সেই গুপ্তি-ছড়ি, খানিকটা দড়িদড়া— যা হাতের কাছে জুটেছে জড়ো করে বেরিয়ে

পড়েছি আমরা।

ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে এবারে একেবারে উলটো রাস্তা।

আসলে কুমারসাহেব বুঝে নিয়েছেন, ঘুরপথে না গেলে ওই জায়গাটিতে আমরা পৌঁছতে পারব না। মানে, যেসব বাধা আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে— তা সরাসরি পথে কিছুতেই ডিঙনো যাবে না। ঘুরপথে, পাহাড়ের ওপাশ থেকেই একমাত্র যাওয়া যেতে পারে।

গাড়ি প্রথমে বাস রাস্তায় এল। তারপর বাস রাস্তা ধরে উত্তরের দিকে এগোতে লাগল।

কুমারসাহেব বললেন, "মাইল সাতেক রাস্তা পেরিয়ে একটা ছোট গাঁ দেখা যাবে। সেই গাঁ ছাড়িয়ে দেড়-দু' মাইল এগিয়ে গেলে বাঁ হাতি পথ। পাহাড়ি রাস্তা। সেই পথই ঘুরতে-ঘুরতে কখন এক সময় ওপাশে চলে গিয়েছে পাহাড়ের। সেই পথ ধরেই এগোতে হবে।"

আনন্দ বলল, "লরিঅলা কি কিছু পথের হদিস দিয়ে গিয়েছে নাকি!"

কুমারসাহেব বললেন, "খানিকটা।"

আমাদের ট্রেকার গাড়ি চমৎকার ছুটছিল। আজকের আবহাওয়া পরিষ্কার। আকাশে মেঘ নেই। পড়ন্ত বিকেল ফুরিয়ে আসছিল ক্রমশ। আলো ছিল তখনও। হাওয়া দিচ্ছিল এলোমেলো। আশপাশের মাঠ, জঙ্গল, গাছপালা দেখতে-দেখতে ঝাপসা হয়ে আসছে।

কুমারসাহেব নজর করে রাস্তা দেখছিলেন। ড্রাইভারকে বলছিলেন, কোথায় কখন মোড় নিতে হবে।

একসময় আমরা পাহাড়ি পথের খানিকটা বেড় দিয়ে সত্যি-সত্যি ওপাশে পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের। এক পাহাড়ি

নদীও চোখে পড়ল। চওড়া বেশি নয়, পাথরে ভর্তি, কিন্তু বর্ষার জল পেয়ে বয়ে চলেছে।

গোধূলি নেমে গেল।

দেখার মতন দৃশ্য। আকাশের একপ্রান্ত রাঙিয়ে সূর্য ডুবছে। কী বিশাল দেখাচ্ছিল সূর্যটাকে। আর কী গাঢ় লাল।

মনে অন্য চিন্তা, গোধূলির শোভা দেখার সময় তখন নয়।

যেতে-যেতে ঝাপসা অন্ধকার নেমে এল।

আরও খানিকটা এগিয়ে গাড়ির আলো জ্বালল ড্রাইভার।

দু'দিকে ঢাল। ঝোপঝাড়, জঙ্গল, মাঠ, পাথরের বড়-বড় চাঁই।

আধ মাইলও নয়, খানিকটা এগোতেই আচমকা শব্দ। গুলির শব্দ যেন।

গাড়ি থেমে গেল।

টায়ার ফেটে গেল নাকি! ফাঁকা জায়গায় শব্দটা কানে লেগেছিল বিকট হয়ে।

আখলা ট্রেকার থেকে নেমে পড়ে চাকা দেখতে লাগল। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।

টর্চ চাইল আখলা।

টর্চের আলোয় চাকাগুলো দেখল ভাল করে। বলল, "টায়ার ঠিকই আছে।"

আবার উঠে বসল আখলা নিজের জায়গায়।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে হেড লাইট জ্বেলে গজ পঞ্চাশ এগিয়েছে কি আবার সেই বিকট শব্দ।

গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল।

কুমারসাহেব বললেন, "মাই গড, গোলি চালাচ্ছে।"

গুলি চালাচ্ছে! কে? কেন?

আমরা কিছু বলার আগেই কুমারসাহেব, বললেন, "গেট ডাউন। মাথা বাঁচাও। গাড়ির পাশে বসে পড়ো।"

আমরা লাফিয়ে নেমে পড়লাম। হতভম্ব। ভয়ে বুক কাঁপছে। বুঝতেই পারছি না, হঠাৎ এখানে কে বা কারা গুলি চালাবে! কেনই বা! এদিকে কি ডাকাত-টাকাত আছে!

কুমারসাহেবও নেমে পড়েছিলেন। ড্রাইভারও।

আমরা গাড়ির আড়ালে গা-মাথা লুকিয়ে বসে থাকলাম।

আনন্দ বলল, "কুমারসাহেব! কারা গুলি চালাচ্ছে?"

কুমারসাহেব নিজেই বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। বললেন, "বুঝতে পারছি না। আমাদের কাছে বন্দুকও নেই যে জবাব দেব।"

আমি বললাম, "ডাকাত নাকি?"

"ডাকু! এখানে! না ... !"

আচমকা কিছু ঘটলে এমনিতেই মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। এ তো আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা। একেবারে নির্জন নিস্তব্ধ পাহাড়তলির পাথুরে রাস্তায় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে যদি গুলি উড়ে যায় আমাদের বুদ্ধি যে লোপ পাবে তাতে আর সন্দেহ কী!

কুমারসাহেব কী ভেবে ফিসফিস করে ড্রাইভারকে বললেন যে, ও কি চুপি-চুপি গাড়িতে উঠে বসতে পারবে! যদি পারে, গাড়িটাকে হয়তো পিছিয়ে আনা যায়। দশ-বিশ গজ যতটা সম্ভব।

আনন্দ বলল, "তাতে লাভ কী?"

কুমারসাহেব বললেন, "লাভ, আমরা পিছু হটার চেষ্টা করতে পারব।"

"গাড়ি স্টার্ট করলেই শব্দ হবে, কুমারসাহেব।"

আমাদের কোন দিকে, কতটা দূরে, রাস্তার পাশে ঢালুতে বন্দুকবাজরা আছে কে জানে! অন্ধকারও ঘন হয়ে এসেছে।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী বা অমাবস্যা আজ। গতকালই সঠিক করে বুঝতে পারিনি কোন তিথি। আজ মনে হচ্ছে, গতকাল চতুর্দশীই ছিল। আজ অমাবস্যা। অন্ধকারে আশপাশ ভাল করে ঠাওর করাই যাচ্ছে না এখন।

আখলা গুঁড়ি মেরে-মেরে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

কুমারসাহেব বললেন, "সরে যাও, গাড়ি ব্যাক করবে।"

আমরা সরে গেলাম হামাগুড়ি মেরে।

গাড়িতে স্টার্ট দিল আখলা। শব্দ হল। এই শব্দ কি চাপা দেওয়া যায় এই ফাঁকায়!

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে আবার গুলির শব্দ। মাটিতে শুয়ে পড়লাম আমরা। আখলা ভয় পেয়ে নিজের থেকেই গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিল।

মড়ার মতন পড়ে আছি আমরা মাটিতে। হঠাৎ শুনি পায়ের শব্দ। কে যেন কড়া গলায় বলল, "স্টপ। ডোন্ট মুভ।"

মুখ তুলে দেখি, কোন আড়াল থেকে দুই মূর্তিমান যমদূত যেন হাজির হয়ে গিয়েছে। হাতে রাইফেল। একেবারে মিলিটারি মার্কা ইউনিফর্ম।

আমাদের ওরা দাঁড়াতে বলল রুক্ষ গলায়।

হুকুম মতন উঠে দাঁড়ালাম। ভয়ে হাত-পা কাঁপছে।

ওদের মধ্যে একজন আকাশের দিকে রাইফেলের নল তুলে ফায়ার করল। ভয় দেখাল আমাদের। মনে হল, আগেও যেন ওরা একই ভাবে ফায়ার করেছিল, আমাদের গাড়িটাকে দাঁড় করাতে।

ওদের কাছে টর্চ ছিল। জোরালো আলো। আলো জ্বেলে মুখ দেখল আমাদের। গাড়ি দেখল।

একজন অন্যজনকে বলল, গাড়িটা একবার দেখে নিতে।

যাকে বলল, সে তার টর্চ জ্বেলে আমাদের ট্রেকারের ভেতরটা দেখতে লাগল।

"হু আর ইউ ?"

কুমারসাহেব বললেন, "আমরা নিরীহ সাধারণ মানুষ, এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম।"

"কাঁহা ? কিধার ?"

আমরা কোথায় যাচ্ছিলাম দু-চার কথায় কী বোঝাবেন কুমারসাহেব ! তবু বললেন ; সব কথা ভাঙলেন না।

আমাদের সামনে যে দাঁড়িয়ে ছিল, কথা বলছিল, সে বলল, এই রাস্তাটা পাবলিকের জন্যে নয়। আমরা কি অন্ধ ? রাস্তার শুরুতেই যে বোর্ড দেওয়া আছে, লেখা আছে বড়-বড় হরফে— সেগুলো কি আমরা নজর করিনি ?

সত্যি আমরা নজর করিনি। কেন করিনি কে জানে ! এত বড় ভুল কেমন করে হল ?

আমাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না ওর।

গাড়ির কাছ থেকে অন্য মিলিটারি ফিরে এল। দু'জনে কী কথা হল কে জানে !

তারপর যা ঘটল— আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

আমাদের গাড়িতে গিয়ে বসতে বলল লোকটি।

হিন্দিতে বলল, তোমরা গাড়িতে গিয়ে বসো। মুখ নিচু করে বসবে। ঘাড় তুলবে না। আশপাশে তাকাবার চেষ্টা করবে না। করলে তোমাদের ওপর বাধ্য হয়ে গুলি চালাতে হবে। যাও, গাড়িতে উঠে বসো। তোমাদের ড্রাইভারও বসে থাকবে, গাড়ি চালাবে না। গাড়ি আমরা চালাব।

হুকুম মতন আমরা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। ঘাড়-মাথা নিচু করে না বসে উপায় কী ! মুখের সামনে রাইফেল হাতে

মিলিটারি। অন্যজন গাড়ির স্টিয়ারিং ধরল।

কী যে ঘটছে আমরা যেন অনুভবই করতে পারছিলাম না। বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। ভয়ে গলা কাঠ। বুক কাঁপছিল। ধকধক শব্দটাও শুনতে পাচ্ছিলাম।

কুমারসাহেব যা অনুমান করেছিলেন— সেটাই তবে ঠিক। এদিকে মিলিটারিদের কোনও ব্যাপার আছে তা হলে! কী— তা অবশ্য অনুমান করা সম্ভব নয়।

হেড লাইট জ্বালিয়ে ট্রেকারটা ছুটছিল তা তো বোঝাই যায়। কিন্তু কোথায় চলেছে কে জানে!

কুমারসাহেব কিছু যেন বলবার চেষ্টা করলেন একবার। ধমক খেলেন সঙ্গে-সঙ্গে, "বাত মাত বোলো।"

আনন্দ পা ঘষছিল গাড়ির মেঝেতে, ধমক শুনে তার পা স্থির হয়ে গেল।

ঠিক কতক্ষণ গাড়ি চলল বলতে পারব না। বিশ-তিরিশ মিনিট হতে পারে। বেশিও হতে পারে। তারপর আমরা যেন অন্য কোনও অজানা অচেনা জায়গায় এসে পড়লাম।

আলো জ্বলছে, কিন্তু অনুজ্জ্বল। একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মনে হয় বড় কোনও ডায়নামো চলছে কোথাও।

ফটকে গাড়ি দাঁড়াল বোধ হয়। কী কথা হল গার্ডদের সঙ্গে। গাড়ি এগিয়ে গেল আবার। সামান্য এগিয়েই থেমে গেল।

হুকুম হল, গেট ডাউন।

আমরা নেমে এলাম।

একটা ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল।

ঘরটা ছোট। দুটি জানলা। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র নেই। শুধু কয়েকটা ক্যাম্প খাট পড়ে রয়েছে। আর কাঠের একটা চেয়ার।

লোক দুটো আমাদের কিছুই বলল না। কেন আমাদের ধরে আনা হল, এই জায়গাটাই বা কোন জায়গা, কতক্ষণ আমাদের থাকতে হবে এখানে, কারও সঙ্গে দেখা করতে হবে কিনা—কিছুই জানাল না। শুধু হুকুম করল, এখানে অপেক্ষা করো। হুকুম দিয়ে তারা বাইরে চলে গেল, বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। যদিও ধারণা করতে পারছিলাম না ব্যাপারটা কী, তবু অনুমান করছিলাম, আমাদের সন্দেহ করে গ্রেফতার করা হয়েছে। থানা আমি দেখেছি, থানার লকআপও আমার বাইরে থেকে দেখা। এটা থানা নয়, লকআপ কুঠরির চেহারাও এই ঘরের নয়, তা সত্ত্বেও বোঝা যায়—আমরা এখন নজরবন্দি।

সমস্ত ঘটনাটাই এমন আকস্মিক যে, আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করব, কী ঘটল—তার সুযোগও পাইনি। কেমন করে পাব! গাড়িতে মাথা হেঁট করে বসে থাকতে হয়েছে, কথা বলতে দেওয়া হয়নি। মিলিটারি-মার্কা যমদূতের রাইফেলের গুলি খেতে কার সাধ যায়!

ঘরে আসার পর কিছুক্ষণ আমরা কথাও বললাম না

ভয়ে-ভয়ে। বাইরে তো গার্ড আছে। পায়ের শব্দ পাচ্ছিলাম। গলাও শোনা যাচ্ছিল।

কুমারসাহেব তাঁর হাতঘড়ি দেখলেন। মাথা চুলকে খাটো গলায় বললেন, "পাস্ট সিক্স থার্টি। আমাদের কতক্ষণ ওয়েট করাবে?"

আনন্দ মাথা নাড়ল। হতাশ গলায় বলল, "জানি না।"

ঘরে বাতি জ্বলছিল। ইলেকট্রিক আলো। তবে কমজোরি। মেটে হলুদ রং আলোর।

আমি বললাম, "কুমারসাহেব, আমরা তো অ্যারেস্ট হয়ে গেলাম।"

"হ্যাঁ।"

"কী হবে এখন?"

"দেখা যাক... !"

আনন্দ বলল, "পুলিশের হাতে পড়লেও কথা ছিল, এ একেবারে মিলিটারি! ছেড়ে কথা বলবে না।"

কুমারসাহেব বললেন, "এরা মিলিটারি, না, প্যারা মিলিটারি?"

"ওই একই হল!" আনন্দ বলল, "ওরা যাই হোক, আমাদের কী হবে?"

আখলাকেও আমাদের সঙ্গে একই ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে বোকার মতন একপাশে মাটিতে বসে ছিল।

আমি বললাম, "কুমারসাহেব, আমরা কোনও অন্যায় করিনি। দোষ বলতে শুধু ওই প্রোটেক্টেড রাস্তায় এসে পড়েছিলাম। ভুল করে। তার জন্যে এই ঝঞ্ঝাট!"

কুমারসাহেব কিছু বললেন না, জানলার কাছে সরে গিয়ে বাইরের দিকটা দেখার চেষ্টা করছিলেন। জানলাগুলো ছোট। ব্যারাকবাড়ির জানলার মতন দেখতে। কাচের শার্সি আঁটা।

কোনও গরাদে শিক নেই জানলার। তা বলে জানলা টপকে আমরা যে পালাব—তার কোনও উপায় নেই। পালাবার আগেই গুলি খেয়ে মরতে হবে।

দেখতে-দেখতে সাতটা, সাড়ে সাতটা বেজে গেল। কেউ আমাদের ডাকতে এল না, কথা বলতেও নয়।

সময় যত যাচ্ছিল ততই আমাদের ভয়, উদ্বেগ বাড়ছিল। গলা শুকিয়ে কাঠ। এইভাবেই কি আমাদের রাত কাটাতে হবে? বাইরের কাউকে কি ডাকা যাবে না? জিজ্ঞেস করা যাবে না কিছু? অন্তত ওরা তো আমাদের জলের বোতলগুলো এনে দিতে পারে!

কুমারসাহেবকে বললাম, "সার, একটু জলের ব্যবস্থা না হলে মরে যাব। বুক ফেটে যাচ্ছে!"

আনন্দরও তেষ্টা পেয়েছিল।

কুমারসাহেব কী ভেবে দরজার কাছে গিয়ে ধাক্কা মারলেন দরজায়। জোরে অবশ্য নয়।

দরজা খুলে গেল। বাইরের লোকটির মুখ আমরা দেখতে পেলাম না।

গলা বাড়িয়ে কুমারসাহেব জলের কথা বললেন।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সামান্য পরে একজন স্টিলের জগ আর কাচের দুটো গ্লাস এনে দিল আমাদের। বেঁটেখাটো চেহারা, পরনে খাকি রঙের পাজামা, গায়ে ঢলঢলে গেঞ্জি। তাকে দেখলে ক্যান্টিন বয় বলে মনে হয়। সে একা আসেনি। সঙ্গে এক গার্ড।

ওরা চলে গেল।

আমরা জলের জগটা প্রায় শেষ করে ফেললাম।

আটটাও বেজে গেল।

না, আজ আর ছাড়া পাওয়ার উপায় নেই। কেউ আসছে না,

কিছু জানতেও পারছি না। আমরা কি এইভাবে পড়ে থাকব!

সওয়া আটটা নাগাদ একজন এলেন। দোহারা চেহারা। মিলিটারি পোশাক চড়ানো নেই। পরনে প্যান্ট, গায়ে বুশ শার্ট, পায়ে চটি। বয়েস চল্লিশের বেশিই মনে হল।

কুমারসাহেব নিজেই কী বলতে গেলেন। ভদ্রলোক মন দিয়ে শুনলেন না। বললেন, আজ আমাদের এখানে এইভাবেই থাকতে হবে। কাল সকালের আগে অফিসার কথা বলতে পারবেন না।

"কিন্তু আমরা কোন অপরাধে এই শাস্তি পাচ্ছি? কী দোষ করেছি যদি বলেন!"

উনি আমাদের কোনও কথাই শুনবেন না। হাসি-হাসি মুখ করে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যেন, বললেন, "ইউ উইল গেট ইওর ফুড হিয়ার। নাউ ডোন্ট আস্ক মি এনি কোশ্চেন।"

ভদ্রলোক চলে গেলেন। অর্থাৎ, তোমরা বাপু আর চেঁচামেচি কোরো না। এখানে খেতে পাবে; খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো।

কুমারসাহেব রেগে গিয়েছিলেন। গজগজ করতে লাগলেন।

কে আর আমাদের রাগের কথা শুনছে!

আনন্দ বলল, "কৃপা, এমন জানলে কে এদিকে আসত! জানি না—কাল কী হবে!"

কুমারসাহেব বললেন, "আমাদেরই বোকামি! এদের রাস্তায় ঢোকার আগে কেন যে ওয়ার্নিংটা দেখলাম না। একেবারে নজর এড়িয়ে গেল! এখন আর আফসোস করে লাভ নেই। যা হওয়ার হবে।"

আমার মনে হল, রাস্তার মুখে যদি কিছু নজরে আসত—তবু যে আমরা গাড়ি ঘুরিয়ে নিতাম—তা হয়তো নয়। কৌতূহল মানুষকে চুম্বকের মতন টানে। আমরা কি আরও খানিকটা না এগিয়ে এসে থেমে যেতাম! বোধ হয় নয়।

খানিকটা পরেই খাবার এল। রুটি, ডাল, ভাজি, ডিমের কারি।

যারাই আমাদের ধরে এনে থাকুক তারা যে বোধবুদ্ধিহীন নয়, তা বোঝা গেল। রাতের খাবার এভাবে পাওয়া যাবে আমরা ভাবিনি। কিন্তু একরাত উপোসে মানুষ মরে না, আমরা ভেতরে-ভেতরে দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছিলাম।

রাত কাটল।

পরের দিন সকালে হাত-মুখ ধোওয়ার পর এক গ্লাস করে গরম চা পাওয়া গেল। চায়ের সঙ্গে একটা করে গোল বিস্কিট। সুজির বিস্কিটের মতন খেতে।

এরই মধ্যে বাইরে বেরিয়ে হাত-মুখ ধোওয়ার সময় আমরা আশেপাশে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছি, জায়গাটা চারদিক দিয়ে আড়াল করা। গাছপালা কম নেই, ব্যারাক বাড়িও নজরে পড়ে। জলের ট্যাঙ্ক আছে, যদিও মাথায় উঁচু নয়, সরু-সরু রাস্তা, পাথর-নুড়ি ছড়ানো; একটা জিপগাড়িও চোখে পড়ল, পাশেই মোটরবাইক—মিলিটারি বাইক যেমন দেখতে হয়—সেইরকম।

অপেক্ষা করে আছি কখন আমাদের ডাক পড়বে।

সওয়া আটটা নাগাদ ডাক পড়ল আমাদের। একজন গার্ড এসে নিয়ে চলল অফিসারের ঘরে।

অফিসারের ঘর বলতে দেখি, ছোট একটা ঘর। মাথায় কাঠের সিলিং। দেওয়ালেও কাঠের প্যানেল। গায়ে রং করা। মেঝে মামুলি। পাখা, আলো, চেয়ার আর বড় একটা টেবিল ছাড়া সে-ঘরে আর কোনও আসবাব নেই।

অফিসার আমাদের দেখলেন।

ভদ্রলোককে দেখতে সুন্দর। বয়েস হয়েছে। পঞ্চাশ হবে।

পরনে সাদা প্যান্ট। গায়ে সাদা বুশ শার্ট। মিলিটারির কোনও নামগন্ধ নেই পোশাকে।

ওঁর মুখ দেখে মনে হয় বড় সাদাসিধে সরল মানুষ। হাসি-মাখা দৃষ্টি।

নিজের পরিচয় দিয়ে অফিসার বললেন, তাঁর নাম এন. কাওলা। মেজর কাওলা।

কথাবার্তা শুরু হওয়ার আগে একজন আরদালি গোছের লোক একটা যন্ত্র এনে টেবিলের ওপর রাখল। যন্ত্রটা দেখতে অনেকটা টাইপ রাইটার মেশিনের মতন। কিন্তু টাইপ মেশিন নয়। চারদিক ঢাকা, হয় কাচে, না হয় ফাইবার গ্লাসে। মেশিনটা ঝকঝক করছিল। মেশিনের প্লাগের সঙ্গে টেবিলের আড়ালে রাখা ইলেকট্রিক পয়েন্টের কানেকশান করে দিয়ে সে চলে গেল।

কাওলাসাহেব মেশিনের বোতাম টিপে কী যেন দেখে নিলেন।

ওটা কিসের যন্ত্র আমরা বুঝতে পারছিলাম না। লাই ডিটেকটার, টেপ রেকর্ডার, না আরও জটিল কিছু!

একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম। কাওলাসাহেবের দিকে যন্ত্রটার মুখ। সেখানে নিশ্চয় কোনও আলো জ্বলার ব্যবস্থা আছে। নয়তো যন্ত্রটা চালু করার সঙ্গে-সঙ্গে সবুজ একটা হালকা আভা কেন ছড়িয়ে পড়বে, আর কাওলাসাহেবের ধবধবে সাদা জামার ওপর তার ফিকে রংই বা কেন দেখা যাবে!

কথাবার্তা শুরু হল।

প্রথমেই কুমারসাহেব। তিনি নিজের পরিচয় ও কাজকর্মের কথা জানিয়ে—আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার বৃত্তান্ত জানালেন। তারপর আমরা কেন, কবে থেকে এই মানডিগড়ের আশেপাশে ট্রেকার নিয়ে ঘোরাফেরা শুরু করেছি—তাও বললেন। কোনও

কথাই লুকোলেন না। শেষে বললেন, কাল ভুল করে এই প্রোটেকটেড রাস্তায় চলে এসেছিলেন।

কাওলাসাহেব একটিও কথা বলছিলেন না। মেশিনের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন, কদাচিৎ চোখ তুলে কুমারসাহেবকে দেখছিলেন।

কুমারসাহেবের পর আমার পালা।

নিজের পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়ে কাজকর্মের কথা বললাম। তারপর বড়দার ডায়েরির কথা। কেন আমি আমার বন্ধু আনন্দকে নিয়ে এতদূরে ছুটে এলাম—এখানে এসে যা-যা ঘটেছে, কোনও কথাই বাদ দিলাম না।

আমার পরে আনন্দ।

শেষে আখলা।

আখলা গাড়ির ড্রাইভার, কুমারসাহেবের গাড়ি চালায়। মনিব তাকে যেখানে যেতে বলেন সে যায়। তার বেশি তার আর বলার কী থাকতে পারে! আমাদের সঙ্গেই এই ক'টা দিন সে ঘুরছে।

আমাদের কথা শেষ হল।

আখলাকে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললেন কাওলাসাহেব।

সে চলে গেল।

সামান্য সময় চুপচাপ থাকার পর কাওলাসাহেব বললেন, আমরা যা বলেছি তা চেক না করে আমাদের ছাড়া যাবে না।

কুমারসাহেব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "মেজর, উই আর নট লায়ার্স।"

"মে বি! লেট আস চেক ইট। হোয়ার ইজ দ্য ডায়েরি?"

ডায়েরি কি আমি সঙ্গে করে এনেছি! সে তো ধর্মশালায় আমার ব্যাগের মধ্যে পড়ে আছে। বললাম সে-কথা।

ইংরিজি-হিন্দি মিশিয়ে আমরা কথা বলতে লাগলাম। বাংলা করলে সেগুলো এইরকম দাঁড়ায় :

"একটা ডায়েরিতে কী লেখা আছে সেটা সত্যি-মিথ্যে যাচাই করতে আপনারা এখানে এসেছেন ?"

"না সার, যাচাই করতে আসিনি। আমার দাদার কী হয়েছে জানতে এসেছি।"

"এতদিন পরে ?"

"আমি ডায়েরিটা সবে পেয়েছি কলকাতায়।"

"তখন কি আপনার মনে হয়নি, এতদিন যার খোঁজ পাওয়া যায়নি, সে হয়তো মারা গিয়েছে !"

"মনে হয়েছে।"

"তা হলে কেন এসেছেন ?"

"সার, সঠিক করে জানতে এসেছি—আমার দাদার কী হল ?"

"এভাবে জানা যায় না। ....আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু ডায়েরি দেখতে চাই। মুখের কথায় আমরা বিশ্বাস করি না।"

"নিশ্চয় দেখতে পারেন। কিন্তু সার, ওটা বাংলায় লেখা।"

"আমাদের এখানে বাঙালি অফিসার আছেন। ডক্টর সান্যাল। তিনি ডায়েরি দেখবেন।"

"ইয়েস সার।"

"একটা কথা আপনাদের মনে করিয়ে দি'। আমাদের পেট্রল পুলিশ আছে। মিলিটারি পুলিশের মতন। তারা রাস্তাঘাট টহল দেয়। কাল দু'জন পেট্রল পুলিশ টহল দিতে বেরিয়েছিল। তাদের মোটরবাইক রাস্তায় বিগড়ে যায়। ওরা সেটা মেরামতের চেষ্টা করছিল—এমন সময় আপনাদের গাড়ির শব্দ পায়। তারপর দেখে একটা ট্রেকার আসছে।"

কুমারসাহেব আমার দিকে তাকালেন। পেট্রল পুলিশের মোটরবাইক আমরা কাল দেখতে পাইনি। বোধ হয় রাস্তার পাশে গাছের আড়ালে ছিল, বা ঢালের নিচে। দেখলে নিশ্চয় গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিতাম।

"আপনারা যে আমাদের এই মোস্ট সিক্রেট জোনের ওপারে ক'দিন ধরে ঘোরাফেরা করছেন—আমরা জানি। ওয়াচ টাওয়ার থেকে সেনট্রিরা দেখেছে। রিপোর্ট করেছে। আপনাদের সম্পর্কে আমরা খোঁজখবর না করে ছেড়ে দিতে পারি না।"

"আমাদের আপনি সন্দেহ করেন ? কিসের সন্দেহ ?"

"সরি, এখন আর কিছু বলা যাবে না। আমাদের লোক ওই ধর্মশালায় যাবে। আপনাদের মালপত্র নিয়ে আসবে সেখান থেকে। আপনারা কেউ যেতে পারবেন না।"

"সার, আমরা না গেলে পাঁড়েজি মালপত্র দেবে কেন ?"

"ওটা আমাদের দেখার ব্যাপার।" কাওলাসাহেব হাসলেন, "যান, আপনারা নিজেদের ঘরে যান। ...না, না, ঘাবড়াবেন না, এখানে আপনাদের থাকা-খাওয়ার জন্যে ভাল ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেন্টেলমেন, আপনারা আমাদের অতিথি। আশা করি, ভালই লাগবে জায়গাটা।" উনি হাসলেন।

কাওলাসাহেব যে আমাদের সঙ্গে তামাশা করেননি, খানিকটা পরে সেটা বোঝা গেল।

রাত্রে যে-কুঠরিতে আমরা ছিলাম সেখান থেকে আমাদের অন্য

এক ঘরে বদলি করা হল। এই ঘরটাকে কুঠরি বলা যাবে না। তিনটে লোহার খাট পাতা, তার ওপর বিছানা। বিছানা অবশ্য মামুলি। লোহার গোটা দুয়েক চেয়ার। দেওয়ালে ব্র্যাকেট, জামাটামা ঝুলিয়ে রাখার জন্য। একটা আয়নাও ঝোলানো রয়েছে। এই ঘরের জানলাগুলো সামান্য বড়। জানলায় নেট লাগানো।

ঘরের লাগোয়া স্নানের ব্যবস্থা। কল আছে। এমনকি শাওয়ারও।

আখলাকেও আমাদের পাশাপাশি এক লম্বাটে খুপরিতে থাকতে দেওয়া হল।

থাকার ব্যবস্থা তো ভাল। খাট বিছানা পেতে এভাবে কে থাকতে দেবে এই বনেজঙ্গলে।

দুপুরে খাওয়ার আয়োজনটাও খারাপ দেখলাম না। ভাত, রুটি, ডাল, সবজির ঘ্যাঁট, ছোট-ছোট বাটিতে মাংসের টুকরো, কাঁচা পেঁয়াজ! কুমারসাহেব মাংস খান না। তিনি তাঁর ভাগটা আমাদের বিলিয়ে দিলেন।

কী জানি কেন, কাল যেরকম ভয় পেয়েছিলাম, দুর্ভাবনায় মরে যাচ্ছিলাম—আজ সকালের পর তা সামান্য কমে গিয়েছিল। কাওলাসাহেবের ঘর থেকে ফিরে আসার পর যেরকম আদর আপ্যায়নের ঘটা দেখছিলাম এদের—তাতে মনে হল, আর যাই হোক এরা মানুষ খারাপ নয়। অতিথি-সেবা তো ভালই হচ্ছে। এখন বাকি ঝামেলাটুকু ভালয়-ভালয় মিটে গেলে আমরা বাঁচি! কাওলাসাহেবের কথা থেকে মনে হয়েছে, আমরা কোনও মন্দ অভিসন্ধি নিয়ে ঘোরাফেরা করিনি—এটা জানতে পারলে তিনি আমাদের ছেড়ে দেবেন।

এইসব কারণেই মন খানিকটা হালকা লাগছিল। আমরা ধরেই

নিচ্ছিলাম, আজ বিকেল বা বড়জোর কাল সকালে ছাড়া পেয়ে যাব।

দুপুরের পর একজন আরদালি এল। এসে একটা কাগজ দিল। বলল, সই করতে। কাগজটা অফিস-মেমোর মতন দেখতে। তাতে আমাদের নামধাম লেখা। গতকাল যে আমাদের ধরে আনা হয়েছে তাও লেখা রয়েছে দেখলাম। সই করে দিলাম আমরা। আরদালি চলে গেল।

আনন্দ বলল, "বাইরে একটু ঘুরতে পারলে হত! যতই খাতির দেখাক, বেটারা আমাদের নজরবন্দি করে রেখেছে।"

কুমারসাহেব বললেন, "বাইরে ঘুরতে দেবে কেন? তুমি সব দেখেশুনে যাবে? এদের পুরো ব্যাপারটাই কত সিক্রেট, দেখছ না!"

"তা তো দেখছি। কিন্তু কিসের সিক্রেট তা বুঝতে পারছি না।"

"সেটা তোমার-আমার বোঝার ব্যাপার নয়।"

আমি বললাম, "কুমারসাহেব, এরা কি ধর্মশালায় গিয়েছে? লোক পাঠিয়েছে?"

"কেমন করে বলব!"

"আমাদের মালপত্রগুলো এলে বেঁচে যাই! দাদার ডায়েরিটা দেখলে এরা আমাদের কথা বিশ্বাস করবে।"

"করারই কথা। তবে ওদের খেয়াল!"

আনন্দ হঠাৎ বলল, "সার, আমরা বড় ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেলাম। অফিস থেকে মাত্র সাতদিনের ছুটি নিয়ে বেরিয়েছিলাম। সেটা ফুরিয়ে গেল। এখন যদি আরও ক'দিন আটকে থাকতে হয়, আমার চাকরিটা যাবে। কৃপার কোনও ঝামেলা হবে না। ও প্রায় বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়ায়। একটা টুর দেখিয়ে দেবে।"

অফিসের দুশ্চিন্তা আমারও ছিল। কিন্তু কী করব! আগে কি বুঝেছিলাম, এতরকম ঘটনা ঘটতে পারে!

দেখতে-দেখতে বিকেল হল।

বিকেল আর আজকাল কতটুকু! শরতের শেষের দিক। হতে না হতেই বিকেল ফুরোয়।

কুমারসাহেব অনেকক্ষণ ধরে কী ভাবছিলেন। হঠাৎ বললেন, "আনন্দ, এরা যদি কাল সকালের মধ্যে আমাদের না ছাড়ে, অন্য ব্যবস্থা করতে হবে!"

"অন্য ব্যবস্থা?" আমরা অবাক!

"পালাবার উপায় খুঁজতে হবে।"

আমরা আরও অবাক! "এখান থেকে পালানো! বলছেন কী, সার? এখান থেকে মাছি গলতে পারে না, আমরা পালাব! সেন্‌ট্রি সিকিওরিটি, পেট্রল পুলিশ, বড় ফটক— ! অসম্ভব! এরা কি এতই আলগা যে, চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে পারব!"

কুমারসাহেব মাথা দোলালেন। "আমি সব জানি। কিন্তু যখন আর কোনও উপায় থাকবে না তখন শেষ চেষ্টা করতেই হবে। প্রিজ্‌ন ক্যাম্প থেকে যুদ্ধবন্দিরা পালাত না? নাজিদের বন্দিশিবির থেকে জু-রা পালায়নি অনেকে? অসম্ভব নয় আনন্দ। সম্ভব! তবে রিস্ক আছে। প্রাণের ঝুঁকি! তোমরা সে-ঝুঁকি নেবে না হয়তো, নেওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ। আমি জানি, আমরা জেনেশুনে কোনও অন্যায় করিনি। যা বলার সবই বলেছি এদের। এর পরও যদি না ছেড়ে দেয়, তখন আমি একবার ঝুঁকি নেব। যদি মরতে হয়—মরব। উপায় কী? তা বলে দিনের পর দিন এভাবে পড়ে থাকতে পারব না।"

কুমারসাহেব কথা বলতে-বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। হয়তো হতাশ হয়েই বললেন কথাগুলো।

আমি বললাম, "না কুমারসাহেব, এমন কাজ আপনি করবেন না। আপনি যদি পালাবার চেষ্টা করেন, ওরা আমাদের আরও বেশি সন্দেহ করবে।"

মাথা নাড়লেন কুমারসাহেব। "হাঁ, ও তো ঠিক বাত।"

"দেখি না শেষপর্যন্ত কী হয়! ধর্মশালা থেকে এদের লোক ফিরে আসুক।"

"ঠিক আছে। ওয়েট অ্যাণ্ড সী।"

সন্ধেবেলায় আমাদের তলব পড়ল।

এবার যে-ঘরটিতে গেলাম সেটি কাওলাসাহেবের ঘর নয়। অন্য ঘর। ঘরের আসবাবপত্র কম। তবে আলমারির সংখ্যা তিন-চার।

যে-ভদ্রলোক টেবিলের ওপাশে বসে ছিলেন তিনি ডক্টর সান্যাল। নিজেই পরিচয় দিলেন। "বসুন।"

আমরা সান্যালসাহেবকে দেখছিলাম। গোলগাল চেহারা, মাথায় চুল কম, চোখে মোটা কাচের চশমা। গোঁফ আছে, দাড়ি নেই।

সান্যালসাহেবের সামনে টেবিলে বড়দার ডায়েরি খাতা পড়ে রয়েছে। তার মানে, ওখান থেকে লোক গিয়ে ধর্মশালা থেকে আমাদের মালপত্র উঠিয়ে এনেছে। কখন—তা অবশ্য আমরা জানি না।

সান্যালসাহেব আমাদের দেখলেন অল্পক্ষণ। হাসিমুখেই বললেন, "কৃপাময় কে? আপনি?"

"কৃপাময় না সার, কৃপানাথ। আমি কৃপানাথ।"

"ও! সরি! আপনি কৃপানাথ—! আর এঁরা..."

"আনন্দ, আমার বন্ধু। উনি কুমারসাহেব। এখানে এসে

পরিচয় হয়েছে।"

"ওঁকে আমি আগে কোথাও দেখেছি।"

কুমারসাহেব তাকিয়ে থাকলেন। মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। পারলেন না। "ভেরি মাচ সরি, সার। ইয়াদ হচ্ছে না।"

"মে বি, আই অ্যাম রং।...পরে ভেবে দেখব।" বলে সান্যালসাহেব আমার দিকে তাকালেন। "কৃপাময়বাবু—"

"কৃপানাথ, সার।"

"ও, ইয়েস! কৃপানাথবাবু! আপনার এই ডায়েরি আমি পড়েছি।"

"ধন্যবাদ সার।"

"আমার অনেক সময় লাগল পড়তে।... ভীষণ হেজি। হ্যাণ্ড রাইটিং, ছোট-ছোট। পড়া যায় না। এর মধ্যে কিছু নোট্‌স রয়েছে। এটা ডায়েরি নয়।"

"হ্যাঁ, খুচরো নোট...।"

"আপনার দাদার কথা বলুন।"

বললাম বড়দার কথা। বাড়ির কথা। কেমন করে ডায়েরিটা আমার হাতে এল, কেনই-বা আমি আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিবেদীজির কাছে এলাম, সেখানে কুমারসাহেবের সঙ্গে পরিচয়, তিনি আমাদের সাহায্য করতে চাইলেন, তাঁকে নিয়ে আমরা পাঁড়েজির ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছি।

আমার কথা শুনতে-শুনতে সান্যালসাহেব চুরুট ধরালেন। কুমারসাহেবকেও এগিয়ে দিলেন চুরুটের বাক্স।

"আপনি তা হলে দাদাকে খুঁজতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"এতদিন পর?"

"আমি তো সবেই জানলাম, দাদা এদিকেই এসেছিল।"

সামান্য চুপচাপ থাকার পর সান্যালসাহেব বললেন, "আই অ্যাম ভেরি মাচ সরি, কৃপানাথবাবু! আপনার পক্ষে খবরটা খুব শকিং হবে। আপনার দাদা কিনা তা আমি জানি না। তবে একটি লোক—ভদ্রলোক—আমাদের ওয়াচ টাওয়ারের সেন্‌ট্রিদের চোখে পড়ে যায়। ভদ্রলোক সাম্‌ হাউ, ফেন্সিং টপকে ডিচের কাছে চলে এসেছিলেন। সেন্‌ট্রিরা গুলি চালায়। ডিচের মধ্যেই তিনি পড়ে য়ান। শট ডেড।"

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। মাথা কেমন ফাঁকা লাগল। শ্বাস আটকে গেল গলায়।

"আরদালি?"

সঙ্গে-সঙ্গে লোক ঢুকল ঘরে। সান্যালসাহেব ইশারায় খাবার জল দিতে বললেন।

আরদালি চলে গেল।

আনন্দ আমার পিঠে হাত রাখল। সান্ত্বনা জানাচ্ছিল।

কুমারসাহেব বললেন, "শট ডেড। আর ইউ শিওর?"

"হ্যাঁ। ডেডবডি আমাকেই দেখতে হয়েছে। আমি মেডিক্যাল ম্যান। ডাক্তার। এখানকার চার্জে আছি।"

জল এনে সামনে রাখল আরদালি।

"খেয়ে নে", আনন্দ বলল নিচু গলায়।

জল খেতে-খেতে কী হল কে জানে, গলা আটকে গেল। গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

দাদাকে দেখতে পাব—এমন বিশ্বাস আমার ছিল না। তবু কী জানি কোন ক্ষীণ আশায় ছিলাম—যদি বড়দা বেঁচে থাকে! যদি!...না, এখন আর যদির কিছু নেই। বড়দা এদের গুলি খেয়ে

মারা গিয়েছে। লোকগুলোর ওপর ঘৃণা হচ্ছিল, রাগ হচ্ছিল প্রচণ্ড। নিরপরাধ, অসহায়, নিরীহ একটা মানুষকে এরা গুলি করে মেরে ফেলল!

কুমারসাহেব আমাকে সান্ত্বনা দিতে-দিতে বললেন, "কৃপানাথ, তোমার দাদার দুর্ভাগ্য! শান্ত হও।"

সান্যালসাহেব বললেন, "ভদ্রলোক ভুল করেছিলেন। এদের কোনও দোষ নেই। আমাদের এখানে এরকম ঘটনা আরও দু-তিনটে ঘটেছে। টু টেল ইউ ফ্র্যাংকলি—এই জায়গাটা একেবারেই নিষিদ্ধ এলাকা। এখানে কেউ আসতে পারে না। হুকুম নেই।"

"কেন?" কুমারসাহেব বললেন।

"দ্যাট্‌স সিক্রেট..."

"এটা কি মিলিটারি জোন?"

"না, টেকনিক্যালি তা নয়। তবে প্যারা মিলিটারির কিছু লোককে স্পেশ্যালি ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। তারাই এখানকার সিকিউরিটির চার্জে।"

"এখানে কী হয়?"

"সরি।"

"এটা কি কোনও ডেঞ্জার জোন?"

"অফকোর্স।...বাট নো মোর কোশ্চেন্‌স, সার। প্লিজ!"

"ডক্টর সান্যাল, আমরা সাধারণ মানুষ। এখানকার কোনও কথাই জানি না। কেন এখানে এসেছিলাম আপনি সবই শুনেছেন। এর পর..."

"আমি বুঝতে পারছি আপনারা ইনোসেন্ট। কেন ঘোরাঘুরি করছিলেন—তাও বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার ক্ষমতা নেই আপনাদের ছেড়ে দেওয়ার। ছেড়ে দেওয়ার যিনি মালিক তাঁকে

আমার রিপোর্ট দেব। তারপর তিনি যা করার করবেন।"

আমার কান্নার দমক থেমে গিয়েছিল। চোখ মুছলাম। করার কিছু নেই। বড়দার ভাগ্যে এমন মৃত্যু লেখা ছিল, কে জানত! বিদেশ-বিভুঁয়ে গুলি খেয়ে মারা গেল মানুষটা! কী দরকার ছিল তার রহস্যময় জ্যোৎস্না দেখতে আসার!

কুমারসাহেব অধৈর্য হয়ে বললেন, "ছেড়ে দেওয়ার মালিক কে, সার?"

"কেন?"

"কাওলাসাহেব?"

"না। আমরা কেউ নই। মিস্টার পারেখ। কাল তাঁর কাছে আমি আমার রিপোর্ট জমা দেব। তারপর তিনি আপনাদের তলব করতে পারেন। নাও পারেন। তাঁর মরজি।"

"আমরা ছাড়া পাব না?"

"আশা করি, পাবেন।"

আমরা বুঝলাম এবার আমাদের উঠতে হবে।

তিনজনেই উঠে পড়েছি, হঠাৎ সান্যালসাহেব আমাকে বললেন, "আপনারা যান। আপনারা দু'জন। উনি পরে যাবেন। ওঁর সঙ্গে আমার কথা আছে।" বলে কুমারসাহেবকে দেখালেন ইশারায়।

কুমারসাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন।

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বাইরে আসতেই দেখি গার্ড দাঁড়িয়ে আছে।

আচমকা আঘাত ও শোক পেলে মানুষ যতটা ভেঙে পড়ে আমি আর ততটা ভেঙে পড়লাম না। বড়দাকে দেখতে পাব— এমন বিশ্বাস নিয়ে আসিনি, কৌতূহল নিয়েই এসেছিলাম এখানে। জানতে এসেছিলাম, বড়দার ঠিক কী হয়েছিল, বা হতে পারে!

সেদিক থেকে জানার আর কিছু বাকি রইল না। দাদা নেই।

আমাদের ঘরে এসে মনমরা হয়ে বসে থাকলাম অনেকক্ষণ। আনন্দ আমায় সান্ত্বনা দিল নানাভাবে।

আখলাকে আমাদের পাশেই কোথাও রেখেছে। জানি না। বিকেলের পর তার সঙ্গে দেখাও হয়নি।

কুমারসাহেব আর ফিরছিলেন না। ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল।

আমাদের দু'জনকে বিদায় দিয়ে কুমারসাহেবকে কেন যে ডাক্তার সান্যাল আলাদাভাবে আটকে রাখলেন— তাও আমরা আন্দাজ করতে পারছিলাম না।

আনন্দ বলল, "তখন শুনলি না? ডাক্তার সান্যাল কুমারসাহেবকে দেখে বললেন, আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি!"

"কোথায় দেখবেন!"

"তা কি আর আমরা জানি। আমরা থাকি কলকাতায়, কুমারসাহেব থাকেন এদিকে! কেমন করে জানব!"

"দূর, আমার বিশ্বাস হয় না। ওই একটা কিছু বলে আটকে

রাখল।”

“কেন?”

“হয়তো চেষ্টা করছেন— ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কোনও কথা আদায় করার।”

“আমাদের কোনও কথাই নেই তো আদায় করবে!”

আরও খানিকটা সময় কেটে গেল। আমরা ক্রমশই অস্থির হয়ে উঠছিলাম। উদ্বেগ হচ্ছিল! কুমারসাহেবের ওপর কোনও অত্যাচার হচ্ছে না তো! ভয় হতে লাগল।

এই জায়গাটাই বা এত শান্ত কেন! মানুষজন তো আছে— তবু গলা পাওয়াই যায় না। কদাচিৎ একটা-দুটো কথা ভেসে আসে। গাছপালায় বাতাসের দমকা লাগলে তার মৃদু শব্দও কানে আসে। আর সারাক্ষণ একটা আওয়াজ— ডায়নামো চলার মতন। তবে অত জোর শব্দ নয়, অনেক মৃদু। এখানে নিশ্চয় কোনও ছোট পাওয়ার হাউস আছে। শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। পাওয়ার হাউস না থাকলে এই বাতিটাতি জ্বলত না, পাখা চলত না। আমি ছেলেবেলায় এরকম ছোট পাওয়ার হাউস দেখেছি।

শেষপর্যন্ত কুমারসাহেব ফিরলেন।

মানুষটি যেন এই সওয়া ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টার মধ্যে কেমন বদলে গিয়েছেন। বয়েস হলেও উনি স্বভাবে খানিকটা চঞ্চল ছিলেন, সবসময় নড়াচড়া হাঁটাচলা, করছেন, কথা বলছেন। হাসিখুশি মুখ। হাসাতেও কম যান না। সেই কুমারসাহেবকে দেখলাম, মুখ শুকনো, কপালে ভাঁজ পড়েছে, ঘাম লেপটে গিয়েছে মুখে, গলায়। মনে হল, উনি ভীষণ বিহ্বল হয়ে পড়েছেন।

জল খেতে চাইলেন।

জগে জল ছিল। জল খেলেন। একেবারে চুপ। বসে

থাকতে নিশ্বাস ফেললেন বড় করে। তারপর পাশের বাথরুমে চলে গেলেন।

ফিরে এলেন সামান্য পরে। সারা মুখ-ঘাড় ভিজে। মাথার চুলেও জল ছিটিয়েছেন।

"কী ব্যাপার কুমারসাহেব ?"

"দাঁড়াও !"

কুমারসাহেব পাইপ বের করে তামাক ঠাসলেন। এখনও তাঁর কাছে — পাউচে খানিকটা তামাক আছে।

পাইপ ধরিয়ে ধোঁয়া গিললেন বার কয়েক। শেষে বললেন, "কাল বোধ হয় আমাদের ছেড়ে দেবে।"

আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

"তোমরা কাল চলে যাও। ধরমশালায় নয়, সোজা ত্রিবেদীর কাছে। সেখান থেকে যে-কোনও বাসে নিয়ারেস্ট রেলওয়ে স্টেশন। কলকাতায় চলে যাও।"

আমরা অবাক ! কথাটা যেন বুঝতে পারলাম না। বললাম, "আমরা চলে যাব মানে ! আপনি ?"

"আমার এখন যাওয়া হবে না।"

"তার মানে ?"

"সে তোমরা বুঝবে না। যা বলছি করবে। আমার ট্রেকার নিয়ে তোমরা চলে যাবে। আখলা থাকবে সঙ্গে। ত্রিবেদীর কাছে গাড়ি আর আখলাকে রেখে তোমরা প্রথম বাস ধরেই পালাবে।"

"কেন ?"

"কেন !... এরা যেমন চায়— তেমন না করলেই তোমরা এখানে আটকে পড়বে। এখান থেকে আবার কোন্ জায়গায় নজরবন্দি করে রাখতে পাঠিয়ে দেবে কে জানে ! স্পেশ্যাল

জেলও হতে পারে।”

“বলেন কী! কেন?”

“স্পাইয়িং এজেন্ট হবার অফেন্স—”

কুমারসাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, “স্পাইয়িং করার অফেন্স! মাই গড্!”

“অফেন্সটা ওই ক্যাটাগরিতেই পড়ছে এদের কাছে। তবু ভাল, তোমাদের ধরে বেঁধে রাখবে না, বা ট্রায়াল করবে না। তোমরা ছেলেমানুষ, ডায়েরির লেখাটাও জেনুইন, যদিও ওতে কিছু ভুল আছে—”

“কী ভুল?”

“দেখার ভুল, ভাবার ভুল। তবু জেনুইন ডায়েরি। তা ছাড়া সত্যি-সত্যি এক ভদ্রলোককে ওই সময়ে এখানে গুলি করে মেরে ফেলা হয়।”

এই সময়ে মিলিটারি থালায়— বা ট্রে-তে আমাদের খাবার এসে গেল। চারটে ট্রে পরপর সাজানো।

আমাদের খাবার দিয়ে লোকটা চলে গেল আখলাকে খাবার দিতে।

“নাও, খেয়ে নাও। আনন্দ, পানি লাগাও।”

খিদে খুবই পেয়েছিল, কিন্তু যেসব কথা শুনলাম তাতে আর খাবার ইচ্ছে থাকে না। তবু মুখে কিছু দিতেই হয়। আনন্দ জলের জগ নিয়ে এল। আমরা কোলের ওপর ট্রে সাজিয়ে নিয়ে খেতে শুরু করলাম।

খেতে-খেতে আনন্দ বলল, “আমাদের ছেড়ে দেবে, আপনাকে দেবে না? এর যুক্তিটা কোথায়?”

কুমারসাহেব বললেন, “তোমাদের ছেড়ে দিলেও এদের লোক তোমাদের ফলো করবে। তোমরা জানতেও পারবে না।

কলকাতায় ফিরে গিয়েও ভেবো না, তোমরা সেফ্। দে হ্যাভ দেয়ার এজেন্টস। কিছুদিন তো নজর রাখবে।"

"কেন?"

"এটা এদের নিয়ম।"

"আমরা—"

"শোনো আনন্দ। এই জায়গাটায় কী হয় না-হয় আমরা জানি না। ইট ইজ টপ সিক্রেট। তবে তুমি ধরে নিতে পারো— এমন কোনও সিক্রেট কাজ হয়, হয়তো এক্সপেরিমেন্ট হয়— যা বাইরের কাউকে জানতে দেওয়া যায় না।"

"মিলিটারি ডিফেন্স..."

"আ, ওসব কথা কেন! এখন থেকে লুজ টক করবে না। এখানে এসেছিলে কখনও, তাও ভুলে যাও।"

আমি বললাম, "আপনাকে ছাড়ছে না কেন?"

"তা জেনে কী হবে!"

"আপনাকে কি আমাদের জামিন হিসেবে আটকে রাখছে?"

"না। আমাকেও ছেড়ে দিত।"

"তা হলে?"

"আমি নিজেই এখন এখান থেকে যেতে চাই না।"

আমরা আর কত অবাক হব! কুমারসাহেব নিজেই যেতে চান না!

"আপনি এখানে থাকবেন?"

"হ্যাঁ।"

"কতদিন?"

"বলতে পারছি না। দু-চার দিন হতে পারে, আবার ওয়ান উইক।"

"এরা আপনাকে থাকতে দেবে?"

"সে-ব্যবস্থা সান্যালসাহেব করবে।"

আনন্দ বলল, "কুমারসাহেব, ডক্টর সান্যাল কি আপনার চেনা?"

কুমারসাহেব খেতে-খেতে বললেন, "সান্যাল আমায় দেখেছে। বছর পাঁচ-ছয় আগে কোয়ানা রেঞ্জে আমি একবার বেড়াতে যাই। ফরেস্ট অফিসে আমার এক দোস্ত ছিল। সেখানের আশেপাশের গাঁয়ে সাডান্‌লি প্লেগ দেখা দেয়। আমরা রিলিফ ওয়ার্ক শুরু করি— সে-সময় কাছাকাছি এক জায়গায় মিলিটারি ক্যাম্প বসেছিল। তারাও রিলিফের কাজে এসে পড়ে। তখন সান্যাল আমায় দেখেছিল। মুখের আলাপও হয়। ও আমার জুনিয়ার। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের ছেলে। আমি বেলগাছিয়ার।"

"ও! তা উনি তবে মিলিটারিতে আছেন?"

"হ্যাঁ, কর্নেল সান্যাল। এখন সান্যালকে এদের সঙ্গে থাকতে হচ্ছে। বছর তিনেক আছে। ওর ইউনিট যে-কোনও সময়ে ফেরত নিতে পারে।"

"ও।"

আমাদের খাওয়া প্রায় শেষ।

জল খাওয়া হয়ে গেলে আনন্দ বলল, "কুমারসাহেব, আপনি এখানে থাকতে চাইছেন কেন?"

কুমারসাহেব কথার জবাব না দিয়ে মুখ-হাত ধুতে বাথরুমে চলে গেলেন।

আনন্দ বলল, "কৃপা, এটা ঠিক হচ্ছে না।"

"কী?"

"কুমারসাহেবকে একা রেখে যাওয়া।"

"ঠিক তো হচ্ছেই না। উনি আমাদের সঙ্গে ঘটনাচক্রে জড়িয়ে

পড়েছেন। স্বেচ্ছায়। আমাদের হয়ে না করেছেন কী! ওঁকে ফেলে যেতে আমারও মন চাইছে না।"

"আমার ভাই বিবেকে লাগছে। প্রেস্টিজ। এমনিতেই তো বাঙালি বলে কত দুর্নাম আমাদের নামে! যে-লোকটি যেচে এসে আমাদের সাহায্য করছিলেন— তাঁকে ফেলে আমরা পালাতে পারি না।"

"কিন্তু উনি যে নিজেই থাকতে চাইছেন।"

"উনি থাকলে আমরাও থাকব।"

"আরও পাঁচ-সাতদিন! আমাদের অফিস?"

"গুলি মারো অফিসে। পার্মানেন্ট চাকরি। তাড়াতে পারবে না। ছুটি মঞ্জুর না করে 'উইদাউট পে' করবে! আবার কী!"

"বেশ। তবে ভাই, আমাদের যদি আর থাকতে না দেয় এরা!"

"দেবে।"

"কেমন করে?"

আনন্দ হাসল। বলল, "ম্যানেজ করার চেষ্টা করব। সিক হয়ে পড়ব! বমি, ফুডপয়জনিং, ডায়েরিয়া, কত কী আছে!"

আমি মাথা নাড়লাম, "চালাকি করতে যাস না। এ তোর অফিস কামাইয়ের অজুহাত নয়।"

"তুই দ্যাখ, আমি যাব না।"

কুমারসাহেব ফিরে এলেন।

আনন্দ বলল, "কুমারসাহেব, আমরা ডিসিশান নিয়ে নিয়েছি।"

"কিসের?"

"আমরা আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি না। হয় আপনি আমাদের সঙ্গেই যাবেন, না হয় আপনার পাশমে পাশমে আমরা থেকে

যাব।" আনন্দ বলল, একটু মজাও করল।

কুমারসাহেব আনন্দকে নজর করে দেখলেন। বললেন, "তোমাকে অ্যালাউ করলে থাকবে! তবে থাকলে লাইফ রিস্ক হবে।"

"কেন?"

"যা দেখবে, বেটার লেট মি সে, যা দেখতে পার— তা তোমার নার্ভে সহ্য হবে না।"

"আপনি কী বলছেন, সার!"

"সাফ কথা বলছি।..."

"আপনি পারবেন?"

"আমি বহুত দেখেছি, আনন্দ। আমার লাইফের এক্সপিরিয়েন্স অনেক বেশি।"

আনন্দ বলল, "সার, আপনার কথা আমরা মানছি। কিন্তু আমরা কাওয়ার্ড হতে পারব না। আপনাকে একলা ফেলে রেখে যাব না আমরা।"

কুমারসাহেব কোনও জবাব দিলেন না।

পরের দিন অনেকটা বেলায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হল মিস্টার পারেখের অফিসে। তাঁর দুটো অফিস— পাশাপাশি। একটা অফিসে কোনও অফিসারও ঢুকতে পারেন না পারেখসাহেবের বিশেষ অনুমতি ছাড়া। মানে সেই ঘরে এমন সব জরুরি গোপন কাগজপত্র, কোনও-কোনও জিনিসও আছে যা খুবই সতর্ক হয়ে

সাবধানে রেখে দিতে হয়েছে। পুরো দায়িত্ব পারেখসাহেবের। তিনিই এই জায়গার সর্বময় কর্তা।

আমরা যে সেখানে যেতে পারব তা ভাবাই ভুল। পাশের অন্য ঘরে বড়সাহেবের দু' নম্বর অফিসে তলব পেলাম। সান্যালসাহেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনিই এক নম্বর দু' নম্বর অফিসের কথা বললেন, নয়তো আমরা জানব কেমন করে!

মিস্টার পারেখ আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন কিনা জানি না! ঘরে ঢুকে দেখি, তাঁর টেবিলের দু' পাশে নানান উদ্ভট জিনিসপত্র। ফোন তো আছেই গোটা তিনেক, তা ছাড়া ছোট টিভির মতন এক পদার্থ, গোল-গোল দু-তিনটে বিভিন্ন রঙের কাচের বল, ছোট-ছোট ; মাইকের মাউথ পিসের মতন একটা জিনিস, কাগজ, ফাইল— এইসব।

মানুষটি কিন্তু বেঁটেখাটো, গোল। মাথায় একটিও চুল নেই, নেড়া। চোখে মোটা কাচের চশমা। পুরু গোঁফ। দাড়ি নেই। রং না-ফরসা না-ময়লা। চট করে দেখলে সম্ভ্রম হয়, ভয়ও হয়। পরনের পোশাক মিলিটারি নয়, সাধারণ।

সান্যালসাহেব আমাদের হাজির করিয়ে দিয়ে সামান্য সরে গেলেন। দাঁড়িয়ে থাকলেন। বসলেন না।

আমরাও দাঁড়িয়ে থাকলাম।

উনি আমাদের দেখলেন কিছুক্ষণ, একটা ফাইলের পাতা ওলটালেন। তারপর সান্যালসাহেবকে টেবিলের বাঁ পাশে রাখা চেয়ারে বসতে বললেন ইশারায়।

সান্যালসাহেব বসলেন।

আমাদেরও বসার হুকুম হল, মুখোমুখি বসার।

পারেখসাহেবের গলার স্বর শুনে আমরা অবাক! ওইরকম যাঁর চেহারা, অত ব্যক্তিত্বপূর্ণ, তাঁর গলার স্বর একেবারে মিহি,

মেয়েলি। উনি সান্যালসাহেবের সঙ্গে কথা বললেন। কথা ইংরিজিতে হলেও এত 'গোপন শব্দ'— যাকে আমরা 'সাঁট' বলি সাধারণত— ছিল যে, আমরা কিছুই বুঝলাম না। শুধু বুঝতে পারলাম, উনি আমাদের ছেড়ে দিচ্ছেন।

"আপনারা ছাড়া পেলেন," সান্যালসাহেব বললেন, "সার আপনাদের বয়ান শুনে নিয়েছেন, রিপোর্ট পড়েছেন। ভুল আপনারা করেছেন। তবু সার বলছেন, না-জেনে ভুল করেছেন আপনারা। যাই হোক, এখন যেতে পারেন।"

"যেতে পারি ?"

"পারেন। পাস ওয়ার্ড জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সিকিউরিটিকে। তাদের পোস্ট থেকে বলে দিয়েছে ফটকে। আপনারা ফ্রি। চলে যেতে পারেন।"

বাঁচা গেল ! গলা থেকে যেন শক্ত জিনিসটা নেমে গেল। দমবন্ধ হয়ে ছিল এতক্ষণ।

আমি কুমারসাহেবের দিকে তাকালাম।

"উনি ?"

"পরে যাবেন !"

"কেন ?"

সান্যালসাহেব চোখের ইশারায় আমাদের সতর্ক করে দিলেন। বুঝলাম, পারেখসাহেব বাংলা বোঝেন না বলে এ-ধরনের প্রশ্ন করে পার পেয়ে গেলাম।

আনন্দ হঠাৎ বলল, "সার, আমরা চারজন একসঙ্গে এসেছিলাম। কোনও খারাপ মোটিভ আমাদের ছিল না। আপনারাও সেটা মেনে নিয়েছেন। তা হলে বয়স্ক কুমারসাহেবকে আটকে রাখছেন কেন ? উনি কোনও দোষ করেননি।"

সান্যালসাহেব কিছু বলার আগেই মিস্টার পারেখ সান্যালের

কাছে জানতে চাইলেন, আমরা কী বলছি ?

সান্যালসাহেব আমতা-আমতা করে কী বলতে গেলেন, পারেখসাহেব মাথা নাড়লেন। বললেন, "না না—তোমাদের সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।"

আমরা সান্যালসাহেবের দিকে তাকালাম।

তিনি কুমারসাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

পারেখসাহেব আর অপেক্ষা করবেন না। নীল মতন একটা মোটা কাগজে সই করে সেটা ঠেলে দিলেন সান্যালসাহেবের দিকে। তারপর উঠে পড়লেন।

আমরা উঠে পড়লাম। ধন্যবাদ জানালাম পারেখসাহেবকে।

"চলুন," সান্যালসাহেব বললেন।

আমরা বাইরে আসতেই সান্যালসাহেব অসন্তুষ্ট হয়ে কুমারসাহেবকে বললেন, "আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম, ভেবেচিন্তে কথা বলুন। আপনি তখন একরকম বললেন। আমি রাজি হলাম। এখন সাহেবের কাছে আমায় অপদস্থ করলেন। আপনার বয়েস হয়েছে, দু' রকম কথা বলবেন না। যান— নিজেদের ডেরায় যান। গার্ড আপনাদের সময় মতন রিলিজ করে দেবে। দুপুর নাগাদ। ও.কে.। গুড বাই।"

আমরা কিছুই বুঝলাম না। বোকা।

কুমারসাহেব অপ্রস্তুত।

"কী ব্যাপার কুমারসাহেব ?"

"চলো, ঘরে চলো, বলছি।"

"সান্যালসাহেব এত চটে গেলেন !"

"চলো, ঘরে চলো।"

ঘরে এসে কুমারসাহেব আমাদের ওপরেই খেপে গেলেন।

"তোমাদের কী দরকার ছিল বাহাদুরি করার ?"

"মানে ?"

"আমার কথা তোমরা বলতে গেলে কেন ?"

"বাঃ, আমরা তো আগেই বলেছিলাম— আপনাকে ফেলে রেখে আমরা যাব না ।"

"তোমরা আমার সমস্ত প্ল্যান বরবাদ করে দিলে। তোমরা

বোকা ! আমি সান্যালকে বলেছিলাম— যে করে হোক, আমায় দু-তিনদিন আটকে রাখার ব্যবস্থা করতে। সান্যাল রাজি হয়েছিল।"

"কী করে আটকে রাখত !"

"আমি সিক হয়ে পড়তাম।"

"সিক ?" আমি অবাক !

"ফ্লাই ফিভার। উলটি হত বার কয়েক, বমি। মাথাধরা। চোখ লাল।"

কুমারসাহেব পাগলের মতন কী বলছেন আমরা বুঝতে পারলাম না।

"আপনার ফিভার। কেন ? ফ্লাই ফিভার আবার কী !"

"এখানে একরকম খারাপ মাছি আছে। তার মধ্যে কিছু মাছি কামড়ালে জ্বর হয়। ডেঙ্গু টাইপের।"

"আপনাকে তো মাছি কামড়ায়নি।"

"না।"

"তবে ?"

"ত—বে ! তব্ ! আরে ভাই, সান্যালকে আমি ম্যানেজ করেছিলাম। ফ্লাই ফিভারের কথা সান্যালই বলেছিল। ও আমায় আজ সিক করে দিত। আমি নিজেই উলটিমুলটি খেতাম, থোড়া চুনা চোখে লাগিয়ে লাল করে নিতাম। সান্যাল আমায় আনফিট করে দু-তিনদিন রেখে দিত। সে পাওয়ার ওর আছে।"

"আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না। নকলি সিক হতেন ?"

"ইয়েস।"

"কেন ?"

"দুটো কারণে। দু-একদিনের মধ্যে আবার ওই সিনটা দেখা যাবে। সান্যাল বলেছিল।"

"কোন সিন ?"

"মিস্টিরিয়াস মুনলাইট অ্যান্ড দ্য ভেসেল।"

আমরা বোকার মতন কুমারসাহেবকে দেখছিলাম।

কুমারসাহেব বললেন, "আরও একটা দেখার জিনিস ছিল। কিরপার দাদাকে যেখানে শুট করা হয়েছিল সেই স্পটটা।"

আনন্দ আমার দিকে তাকাল। তারপর কুমারসাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "কৃপার দাদার যেখানে মৃত্যু হয়েছে— মানে গুলি খেয়েছেন দাদা— এতকাল পরে সেই জায়গাটা দেখে আপনার কী হবে !"

কুমারসাহেব বললেন, "ধরো সেন্টিমেন্ট।"

"তাই কি !"

"আরও কারণ আছে। টাওয়ারের গার্ডরা তাঁকে গুলি করেছিল— না কি যেটা নেমে আসে— সেই বোট টাইপের নৌকোর মতন যন্ত্রটা থেকে তাঁকে কেউ ফ্ল্যাশ টার্গেট করেছিল !"

"মানে ! ফ্ল্যাশ টার্গেট কী ?"

"আমি জানি না। তবে সান্যাল বলল, আলোর একটা ঝলক— তীরের মতন এসে হিট করে।"

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। পরে বললাম, "দাদা মারা গেছে এটাই সত্য। কী করে মারা গেল তা জেনে আর লাভ কী !"

আনন্দ বলল, "সার, তবে যে সান্যালসাহেব আমাদের বলেছিলেন, ওয়াচ গার্ডরা গুলি করেছে। তিনি নিজে ডেডবডি দেখেছেন।"

"সান্যাল দেখেছে। সেটা ঠিক বাত। তবে সে বলতে পারছে না— গুলি, না ফ্ল্যাশ হিটে মারা গেছে। অফিসিয়ালি তাকে যা বলতে হবে— তাই লিখেছিল। উপায় ছিল না।"

আমরা আর কী বলব ! এখানকার সবই অদ্ভুত ! কিসের জ্যোৎস্না, কিসের ওই শব্দ, কেমন করেই বা একটা নৌকোর মতন জিনিস আলোয় নেমে আসে নিচে, কেমন করে জানব !

কুমারসাহেব বললেন, "তোমরা একটা চান্স নষ্ট করলে। আমি থাকলে, আর যদি ওই অদ্ভুত ঘটনা দু-একদিনের মধ্যে ঘটত—

দেখে নিতে পারতাম। আর হল না!"

"আপনাকে দেখতে দিত?"

"সামনাসামনি দিত না। তবে লুকিয়ে হয়তো দেখা যেত।"

"ওটা কী?"

"ইউ-এফ-ও নয়।"

"কী তবে?"

"তা ওরা বলবে না।"

"সান্যালসাহেবও বলেননি?"

"না।"

আনন্দ বলল, "আমি জানি না সার আপনি কেমন করে দেখতেন? বোধ হয় দেখতে পেতেন না। ... যাক্ গে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এখন ছাড়া পেলেই আমরা পালাব।"

কুমারসাহেব মাথা নাড়ালেন হতাশায়। বললেন, ডাক্তার সান্যালকে ভজিয়ে-ভাজিয়ে তিনি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা আর হল না। ভাগ্যই মন্দ!

দুপুরের পর আমাদের ছেড়ে দেওয়া হল।

নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে ট্রেকার গাড়ি করে আমরা ফিরে চললাম পুরনো আস্তানায়।

আখলা গাড়ি চালাচ্ছিল। আমরা চুপচাপ।

অনেকটা পথ এগিয়ে এসে কুমারসাহেব বললেন, "আনন্দ, দো-তিনদিন আমরা ধরমশালায় ওয়েট করতে পারি।"

আনন্দ আর আমি তাকালাম।

কুমারসাহেব বললেন, "ওয়েট করলে— ওই সিন আবার দেখতে পাব। এভরি চান্স।"

"কেমন করে?"

"ফেন্সিংয়ের বাইরে থেকে।"

"তাতে লাভ ?"

"আমাদের জানতে হবে ব্যাপারটা কী !"

"এভাবে কি জানা যায় সার ?"

আমি বললাম, "কুমারসাহেব, আপনি বলেছেন, আমাদের ছেড়ে দিলেও ওরা আমাদের ওয়াচ করবে। তাই যদি হয়, কালই ধর্মশালা না ছাড়লে ওরা এসে আবার ধরবে।"

মাথা নাড়লেন কুমারসাহেব। "সব ঠিক। তবে একবার রিস্ক নিলে যদি ..."

কথা শেষ হওয়ার আগেই এক বিকট শব্দ। আবার গুলি নাকি !

আখলা গাড়ি থামিয়ে দিল। তারপর নিচে নামল। চাকা দেখতে-দেখতে বলল, "টায়ার ফেটে গিয়েছে।"

আমরা নেমে পড়লাম। চাকা পালটাতে হবে।

গাড়ির চাকা পালটে ধর্মশালা।

পাঁড়েজি আমাদের দেখে চোখমুখের যা ভাব করল, যেন ভূত দেখছে। সেটাই স্বাভাবিক। কেননা, আগের দিন দুটো সেপাই এসে তাকে কম ভয় দেখায়নি। আমাদের খোঁজখবর করেছে, কবে থেকে আমরা এই ধর্মশালায় ছিলাম, কোথায় যেতাম, কী করতাম—এসব জানতে চেয়েছে। তারপর আমাদের যা মালপত্র ছিল উঠিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। খুব বাঁচোয়া যে, পাঁড়েজিদের

ধরে নিয়ে যায়নি। কুমারসাহেবের বাবুর্চিকেও নয়।

আমার যেন আর ধর্মশালায় না থাকি, বাবুজি।

ধর্মশালায় আমরা অবশ্য থাকতাম না। এখানে ওদের নজর পড়বে।

পাঁড়েজিকে নিরস্ত করে বললাম, "কোনও ভাবনা নেই। আমরা চলে যাচ্ছি।"

ধর্মশালা থেকে সটান ত্রিবেদীজির কাছে। তখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে।

ত্রিবেদীজির বাড়িতে আমাদের বৈঠক বসল। উনিও সব কথা শুনলেন। শুনে একেবারে হতভম্ব!

কুমারসাহেব বললেন, আমরা যদি চলে যাই তবে তো কথাই নেই। "মাগর ভাগেগা নেহি।"

তা হলে?

কুমারসাহেবের ধারণা, এত তাড়াতাড়ি ওই ক্যাম্প থেকে কেউ আমাদের খোঁজ নিতে আসবে না। দু-একদিন পরে আসতে পারে। তার আগে আমরা অন্য কোনও শেল্টার খুঁজে নেব। নিতেই হবে। ওরা যদি আসে মনোহর বলবে, আমরা চলে গিয়েছি।

আনন্দ বলল, "এখানে শেল্টার নেওয়ার মতন জায়গা কোথায় কুমারসাহেব? আর এখান থেকে ক্যাম্পও তো অনেক দূর।"

কুমারসাহেব মাথা নাড়লেন। ঠিকই। তারপর বললেন, "আজকের রাতটা তো কাটাও, কাল দেখা যাবে।"

গত দিন দুই যে ধাক্কা গিয়েছে তাতে আমরা ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে কুমারসাহেবের সঙ্গে যেতে হল ত্রিবেদীজির বাস

অফিসে। আগেই বলেছি, বাস অফিসে এই অঞ্চলের একটা ম্যাপ টাঙানো থাকত। সেটা সাধারণভাবে রুট ম্যাপ হলেও তাতে কাজচলা গোছের নানান জ্ঞাতব্য জানা যেত। জায়গার নাম, পাহাড়, পর্বত, নদী, জঙ্গল—তারও একটা নামধাম পাওয়া যেত।

কুমারসাহেব সেই ম্যাপ নিয়ে বসলেন।

ত্রিবেদীজির হাতে তখন অনেক কাজ। তিনি কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বাস এল একটা। যাত্রীরা নেমে জিরিয়ে নিচ্ছে। চা, পান, সিগারেট খুঁজে বেড়াচ্ছে কেউ-কেউ। সকালটা একেবারে খটখটে। যেমন উজ্জ্বল রোদ, তেমনই আকাশ।

আমার তো বাড়ির কথা মনে পড়ছিল। মেজদা হাঁ করে বসে আছে—আমি কবে ফিরব সেই অপেক্ষায়। অন্তত একটা চিঠির আশায় সে বসে থাকবে। ভাবছিলাম, এই অবস্থায় আমি কেমন করে জানাব বড়দার দুঃসংবাদটা। কেমন করে লিখব, বড়দাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। কী নৃশংস ঘটনা!

আনন্দও বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত। মাত্র ক'দিনের কথা বলে অফিস ছেড়ে পালিয়ে এসেবে। সামনে পুজো। এইভাবে আর ক'দিন বসে থাকা যায় এখানে! করারও তো কিছু নেই আমাদের!

ঘণ্টাখানেক পরে কুমারসাহেব ডাকলেন আমাদের।

"বলুন, সার?"

"একটা জায়গা পাওয়া গেছে।"

"কোথায়?"

"মনডিগড়ের কাছেই।" বলে তিনি ম্যাপ দেখাতে লাগলেন। "এই যে ফরেস্ট দেখছ, এর নাম বুন্দিয়া ফরেস্ট। এর আশেপাশে ভিলেজ আছে। ওরা কী করে আমি জানি না। মালুম, খেতিউতি করে, কাঠ কুড়োয়, আর মরা জন্তু-জানোয়ারের চামড়া জুটিয়ে

বেড়ায়, দেহাতি ট্যানারি করে। জায়গাটা সেফ। কেন সেফ বলছি জানো? এখানে দেখো—।" বলে কুমারসাহেব একটা কাগজ চেয়ে নিয়ে ম্যাপ আঁকতে বসলেন বুন্দিয়া ফরেস্টের। "এখানে ফরেস্ট, ওখানে বুশ, এই হল ভিলেজ, আর এই যে সরু মতন জায়গাটা পড়ে থাকল—এটা পাথুরে জায়গা। এর কাছেই পুরনো কেভ—মানে গুহা আছে। ওপারে নদী। মান্‌ডিগড়। আমরা একেবারে চুপচাপ বুন্দিয়া ফরেস্টে গিয়ে হাজির হব।"

আমি বললাম, "কেমন করে?"

কুমারসাহেব বললেন, "এখান থেকে ট্রেকার নিয়ে সরে পড়লে আমাদের আর ওরা ট্রেস করতে পারবে না। মনোহর বলবে, আমরা চলে গিয়েছি।"

আনন্দ বলল, "বেশ। তারপর যদি ওরা লোক লাগিয়ে এদিক-ওদিক খোঁজ করে?"

"করুক। কোনও পাত্তা পাবে না। এইসব এরিয়ায় জলদি-জলদি কুছ হয় না, আনন্দ। দুটো-তিনটে দিন আমরা লুকিয়ে থাকতে পারব।"

কুমারসাহেব যে এতটা উৎসাহী হতে পারেন, আমরা আগে বুঝিনি। সত্যি বলতে কী, বড়দা আর নেই—এটা জানার পর মন্দারগড় সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল বিশেষ ছিল না। আর থেকেই বা কোন লাভ হবে! এ তো সাধারণ রহস্য নয়, এমন এক জটিল রহস্য—যেখানে আধা-মিলিটারি ব্যাপারট্যাপার রয়েছে, রয়েছে আশ্চর্য কোনও গোপনতা। আমাদের ওসবে কী দরকার! একবার ধরা পড়ে যে শিক্ষা হয়েছে—তাতে আর ফ্যাসাদে পড়তে চাই না।

কুমারসাহেব আমাদের মনের কথাটা যে আন্দাজ করতে পারছিলেন না—তা নয়, তবু তিনি কেমন নাছোড়বান্দা। জেদ

ধরে গেছে। বারবার বলছিলেন, "আর একবার শুধু ওই দৃশ্যটা দেখব, তারপর ফিরে যাব। আমি বলছি, এর মধ্যে কোনও বাইরে থেকে আসা অবজেক্টের ব্যাপার নেই। দিস ইজ্ সাম শট অব এক্সপেরিমেন্ট। হয়তো মিলিটারিদের কোনও উইং করাচ্ছে, বা ডিফেন্সের আন্ডারে কোনও প্রজেক্ট...। একবার শুধু দেখে নিয়ে পালিয়ে যাব।"

আমরা আর না করতে পারলাম না।

সেদিন বিকেলেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পুরোপুরি তৈরি হয়ে। কুমারসাহেব কোনও খুঁত রাখলেন না। খাবারদাবার, জল, আলো, দড়াদড়ি, মায় একটা স্টোভ, ছোটখাটো তেরপল—আরও কত কী যে জড়ো করলেন, কে জানে! শুধু তাঁর বন্দুকটাই নিতে পারলেন না, কেননা সেটা তো সঙ্গে নিয়ে বেরোননি, বাড়িতে পড়ে আছে।

আগেরবার আমরা যে-পথে মন্দারগড়ের খোঁজে গিয়েছিলাম ধর্মশালা পর্যন্ত—এটা সে-পথ নয়। একেবারে অন্য পথ। আগে গিয়েছিলাম পুব দিক ধরে, এটা দক্ষিণ ধরে যেতে হয়। আগেরবার আমাদের লক্ষ্য ছিল পাঁড়েজির ধর্মশালা। এবার বুন্দিয়ার জঙ্গল।

কুমারসাহেব বলেই দিয়েছিলেন, "ট্রেকার গাড়িটা আমরা জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে রাখব। চেষ্টা করব—গাঁ-গ্রামে না ঢুকে—নির্জন অথচ আড়ালমতন জায়গা খুঁজে নেওয়ার। আমাদের চেষ্টা হবে গুহার কাছে যাওয়ার। সাধারণত দেখা যায়, একজায়গায় কোনও গুহা দেখা গেলে তার আশেপাশে আরও দু-একটা ছোট-বড় গুহা চোখে পড়ে। এটা কেন হয়েছে কে জানে! পৃথিবীতে নাকি এমন জায়গাও আছে

যেখানে এত গুহা যে, তাকে ল্যান্ড অব কেভ্‌স বলা হয়।"

আমরা সন্ধের মুখেই জঙ্গলের কাছে পৌঁছে গেলাম। আশেপাশে কোথায় গ্রাম আছে জানা যাচ্ছিল না। কোথাও একফোঁটা আলো দেখা যায় না, শুধু গাছগাছালি, ঝোপ আর দু-চারটে বুনো পশু।

ট্রেকার গাড়িটা এখানেই রাখা হল।

কুমারসাহেব বললেন, "আজ এই গাড়ির মধ্যেই আমাদের রাত কাটাতে হবে।"

আমরা সেটা জানতাম। তবু আনন্দ ঠাট্টা করে বলল, "জেগে-জেগে বসে থাকতে হবে বলুন ?"

"না জেগে থাকলে কাল দেখবে একটা বুনো কুকুর বা শেয়াল তোমায় টানতে-টানতে বিশ-পঞ্চাশ গজ নিয়ে গিয়েছে।"

"না সার, বুনো কুকুরের হাতে প্রাণ দিতে রাজি নই।"

"তবে জেগে থাকো।"

আমি বললাম, "জেগে থাকতে আপত্তি নেই, কিন্তু কাল সকালে যদি কারও চোখে পড়ে যাই ! গাঁয়ের মানুষজন, কাঠুরে, বা অন্য কেউ ?"

"এদিকে কোনও গাঁ নেই। ম্যাপ দেখে যা বুঝেছি—এটা কাঁকুরে জমির পথ। খেতি করার জমি এখানে নেই, জল পাওয়া যায় না, ইঁদারা খোঁড়াও সহজ নয়।"

"কাল আমরা কোথায় যাব ?"

"সকাল হলেই পালাব। গুহার কাছে যাব। গাড়িটা এখানে কোথাও আড়ালে লুকনো থাকবে।"

আনন্দ বলল, "কুমারজি, সান্যালসাহেবের কথামতন কাল বা পরশু মন্দারগড়ে সেই মিস্টিরিয়াস জিনিসটি আবার আসবে। তাই তো ?"

"হ্যাঁ। দো-তিন দিনের কথা বলেছিল সান্যাল।"

"যদি আর না আসে?"

"হোয়াই?"

"না আসতেও পারে। দেরি করতে পারে। তা হলে, আমরা কিন্তু আর বসে থাকব না। ফিরে যাব। আমাদের ফিরে যেতেই হবে।"

আমি বললাম, "কুমারসাহেব, আমার কাছে পাঁজি নেই—, তবু মনে-মনে হিসেব মিলিয়ে দেখেছি, কৃষ্ণপক্ষ গতকালই বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে। আজ থেকে শুক্লপক্ষ পড়ল। আমার মনে হয়, চাঁদের আলো মোটামুটি ফুটে উঠবে যখন থেকে, তখন আর ওই জিনিসটিকে দেখা যাবে না।"

কুমারসাহেব বললেন, "তোমাদের কথাই মেনে নিলাম। আর দুটো দিন, তারপর আর এখানে থাকব না। মাথাও ঘামাব না মানডিগড় নিয়ে।"

পরের দিন সকাল থেকেই আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। গাড়িটাকে সরিয়ে আড়ালে রাখা গেল। তারপর যত রাজ্যের জিনিস নিজেরা হাতে-হাতে বয়ে চললাম গুহার দিকে।

প্রায় আড়াই কি তিনশো গজ দূরে একটা গুহা পাওয়া গেল। সেটার ডান দিকে দেখি রীতিমতন বড়সড় এক গুহা। গুহাটার কাছাকাছি যেতে মনে হল ভেতর থেকে কেমন এক শব্দ আসছে। কিসের শব্দ?

কুমারসাহেব ভেতরে চলে গেলেন। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে। এখানেই কোথাও দিন দুয়েকের আস্তানা পাততে হবে। বেলার দিকে জায়গাটা ভালই লাগছিল। হালকা জঙ্গল, রুক্ষ মাঠ, পাথর ছড়ানো প্রান্তর, বালিয়াড়ির মতন পাহাড়ের এক ঢল, আর এই

গুহা।

কুমারসাহেব ফিরে এলেন অনেকক্ষণ পরে। তাঁর হাতের টর্চ নিভে গিয়েছে, হাতের লাঠিটা ভিজে।

আমরা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

উনি বেশ হাঁফাচ্ছিলেন। জল খেলেন ফ্লাস্ক থেকে। তারপর বললেন, "এই গুহাটা একেবারে নদীর মুখে গিয়ে পড়েছে। সবে বর্ষা শেষ। নদী এখন ভরা। নদীর জল ঢুকে আছে গুহার মধ্যে। তবে হাঁটুর বেশি জল নেই। ওই জলটুকু ঠেলে নদীর মুখে গিয়ে পড়লেই মান্‌ডিগড়ের সেই ক্যাম্প দেখা যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার, নদীর দিকে ক্যাম্পের কোনও সিকিউরিটি রাখা হয়নি। অন্তত চোখে কিছুই দেখা গেল না।" তিনি যদি আগে বুঝতেন বায়ানোকুলারটা নিয়ে যেতেন। তা তিনি কেমন করে বুঝবেন—এই গুহার মুখ দিয়ে নদীতে যাওয়া যায়!

আনন্দ বলল, "আপনি বলছেন—এই গুহাটা টানেলের মতন সোজা গিয়ে নদীতে পড়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"নদীর দিকে ওদের কোনও পাহারা নেই?"

"দেখতে পেলাম না।"

"ওয়াচ টাওয়ার দেখেছেন ক্যাম্পের?"

"সে অনেক দূরে দেখেছি।"

"নদীর দিকে ওরা লোকজন রাখেনি কেন?"

"সেটাই আশ্চর্যের! হয়তো ভেবেছে নদী দিয়ে কে আর আসতে যাবে! এলে নৌকো করে বা সাঁতার কেটে আসতে হবে। হয়তো তাই এল। তারপর যখন ক্যাম্পের কাছে যাবে—তখন তো ওয়াচ গার্ডরা দেখে ফেলবে।"

আমি বললাম, "আমাদের তা হলে এই গুহার মুখ দিয়ে এগিয়ে

গিয়ে নদীর ধারে উঠতে হবে ?”

“হ্যাঁ। তবে এখন নয়। এখন গিয়ে কোনও লাভ নেই। আমরা বিকেলবেলায় যাব। এখন এসো, পেট ভরাবার ব্যবস্থা করা যাক।”

আনন্দ বলল, “সার, আজ যদি বরাতজোরে ব্যাপারটা মিটে যায়— ।”

“যাবে,” কুমারসাহেব বললেন, “সান্যাল যদি আমাকে মিথ্যে না বলে থাকে—আজ কিংবা কাল আমরা ওই জিনিস দেখতে পাব। আর আমার মনে হয় না সান্যাল মিথ্যে কথা বলেছে।”

আখলা স্টোভটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। শব্দ হচ্ছিল। এই নিস্তব্ধ জায়গায় শব্দটা কিন্তু অন্যরকম লাগছিল। হয়তো ফাঁকা বলে—শব্দটা ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

কুমারসাহেব বললেন, “আমরা যদি প্রথমেই এদিককার রাস্তাটা জানতে পারতাম—অকারণ ওদের পাল্লায় পড়তে হত না।”

বিকেলবেলায় আমরা গুহার অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে নদীর কাছে এলাম।

গুহার মধ্যেটা অন্ধকার হলেও নোংরা নয়। নদীর জল যা ঢুকে পড়েছিল তা অবশ্য কাদাটে রঙের। আমাদের হাতের আলোয় গুহাপথটাকে ভাল করে দেখে নেওয়ার পর মনে হল, জল যেটুকু দাঁড়িয়ে আছে— যদি না থাকত— এখানেই দিব্যি বসে-বসে রাত কাটানো যেত।

আমাদের লটবহর বেশি নয়। তবু ওরই মধ্যে খাওয়া-বসার ব্যবস্থা করতেই হয়েছিল। কিছু জিনিস ট্রেকারের মধ্যেও পড়ে থাকল। উপায় নেই। তখন তো জানতাম না, এমন একটা গুহা পাওয়া যাবে!

বিকেলে আমরা নদীর ধারে। নদী থেকে উত্তর দিকে তাকালে সেই ক্যাম্প দেখা যায়। সাধারণের চোখে হয়তো তা ধরা পড়বে না চট করে, গাছগাছালি দেখে বুঝতে পারবে না, নদীর ওপারে গাছগাছালির আড়ালে এই অদ্ভুত রহস্য লুকিয়ে আছে।

তা গুহামুখের আশেপাশে অজস্র বড়-বড় পাথর। নদীর জলে কোনওটা আধ-ডোবা, কোনওটা শুকনো। দিনের বেলায় এখানে সময় কাটানোর অসুবিধে কিছু নেই, রাত্রে আছে। মাথার ওপর কোনও আচ্ছাদন তো নেই।

ক'দিনের ধাক্কায়, উদ্বেগে আমরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এর পর যদি আরও দু'দিন এখানে রাত কাটাতে হয়, মরে যাব।

আমি যেন সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি। ভাল লাগছে না আর।

আনন্দও কেমন নির্বিকার হয়ে গিয়েছে। যা হচ্ছে হোক গোছের মনোভাব তার।

উৎসাহ শুধু কুমারসাহেবের। এই বয়েসে একটা মানুষ কেমন করে এত চাপ সহ্য করতে পারে কে জানে! হয়তো এইজন্যে যে, কুমারসাহেব এদিককার জলহাওয়ায় মানুষ, কোথায়-কোথায় চক্কর মেরে বেড়ান ট্রেকারে করে, তায় আবার শিকারি। আমাদের মতন কলকাতা শহরের মানুষ তো নয়। জীবনীশক্তি তাঁর বুঝি অনেক বেশি।

কুমারসাহেবের কথামতন আমরা একটা পছন্দসই জায়গা খুঁজে নিলাম। রাত কাটাতে হবে তো!

বড়-বড় কয়েকটা পাথরের আড়ালে জায়গা করা হল। শুকনো জায়গা। আমাদের কেউ দেখতে পাবে না। এই ক্যাম্পের ওয়াচ টাওয়ার থেকেও যদি কেউ দূরবিন লাগিয়ে তাকিয়ে থাকে তবুও দেখতে পাবে না।

দেখতে-দেখতে বিকেল শেষ।

স্টোভ জ্বালাল আখলা। স্টোভে ধোঁয়া উঠবে না। দূর থেকে কেউ বুঝতেও পারবে না এখানে আমরা আছি। অবশ্য স্টোভের শব্দ তো চাপা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সে-শব্দ নদী পেরিয়ে— অত দূরে ক্যাম্পে পৌঁছনো সম্ভব নয়।

আখলা চা করল। বড়-বড় মগে আমরা চা নিলাম, আর আটার রুটি, আলুর তরকারি।

খেয়েদেয়ে এবার তৈরি।

সিনেমায় দেখা অ্যাডভেঞ্চার-ছবির নায়কদের মতন লাগছিল আমাদের।

চাঁদ উঠল। ডুবেও গেল। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ। কতক্ষণ আর থাকবে।

এর পর আর আলো নেই। ধীরে-ধীরে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এখানে কোনও জনমানুষ থাকে না যে শব্দ হবে, পশুপাখিও ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন কী নদীর জলেও যেন শব্দ নেই।

কুমারসাহেব পাইপ খেতে-খেতে বললেন, "আমি সান্যালের কথা ভাবছি।"

"কেন ?"

"তার কথা যেন সত্যি হয়। সান্যালের ইনফরমেশন মতন আজ বা কাল ওই জিনিসটা আবার আসবে।"

"আজ যদি না আসে— !"

"আসবে। মনে-মনে চাইছি— আজই আসুক।"

"আপনি চাইলেই কী হয়!"

"লেট আস হোপ!"

"আপনার কী মনে হয়, সার! আপনি তো বলছেন, বাইরের কোনও জিনিস নয়।"

"নয়। নেভার। যদি বাইরের জিনিসই বিশ্বাস করো— তবে জেনে রাখো, কোনও ইউ-এফ-ও ওভাবে ঘন-ঘন একই জায়গায় আসে না। আসা সম্ভব নয়। সাডান্‌লি আসে হয়তো, চলে যায় আবার। এই জিনিসটা বারবার একই জায়গায় আসবে কেন? মোর ওভার, ওই জিনিসটার জন্যে এদের এমন সাজিয়ে-গুছিয়ে সিকরেটলি বসে থাকা কেন?"

"সেটা আমরাও এখন বুঝতে পারছি।"

"আমি বলছি, এটা কোনও মিলিটারি সিক্রেটের ব্যাপার।"

"আমাদেরও তাই ধারণা। তবে মিলিটারি হলে ওরা তো অন্য কোনও আরও দুর্গম গোপন জায়গা বেছে নিতে পারত, সার!"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমার মনে হয়, যা দেখলাম সান্যালদের ওখানে— পুরো ব্যাপারটাই এখন রিহার্সালি স্টেজের। মানে বুঝলে?"

"মানে, মহড়া দেওয়ার স্টেজে।"

"আই থিংক সো। ...মিলিটারির ডিরেক্ট আন্ডারে নয়— মাগর ডিফেন্স প্রজেক্টে গোপনে অনেক কাজ হয়। সব দেশই করে। গত যুদ্ধের সময়, জার্মানরা করেছিল। ব্রিটিশরা করেছিল। অ্যালায়েড আর্মি করেছিল। ... জানো, আমি তখন একটা সিনেমা দেখেছিলাম। জার্মানদের একটা বিরাট ব্যারাজকে রাতারাতি গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্যে নানান পরিকল্পনা করছে ব্রিটিশ মিলিটারি। কোনও পরিকল্পনাই মনোমতন হচ্ছে না। দু-চারটে

বোমা ফেললেও কাজ হবে না। ডিরেক্ট হিট অনেক সময় টার্গেট মিস করে। আর জার্মানদের ব্যারাজটাও এমনভাবে তৈরি— ডিরেক্ট হিট করা খুব মুশকিল। তখন ওরা ডিফেন্সের আন্ডারে ঠিক নয়— অথচ লিংক আছে— এমন কয়েকজন বিজ্ঞানীকে গিয়ে ধরল। বলল, ব্যবস্থা করে দাও একটা চটপট, কেমন করে রাতারাতি ব্যারাজ গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়, অথচ ডিরেক্ট হিট হবে না। বিজ্ঞানীরা অনেক ভেবে সে-ব্যবস্থা করে দিল।"

"কেমন করে?"

"ইনডিরেক্ট হিট। টেনিস কোর্টে দেখেছ তো, একজন সার্ভ করছে, বলটা একজায়গায় পড়ে ছিটকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। ঠিক সেই রকম— প্রিন্সিপ্‌ল্। একই সঙ্গে অজস্র প্লেন এসে ব্যারাজের কিছুটা আগে, একেবারে অঙ্কের হিসেবমতন বোমা ফেলতে লাগল। জলের বিশাল ঝাপটা উঠে ব্যারাজের নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত হিট করতে লাগল। প্রায় আগাগোড়া। একসঙ্গে প্রায়। ব্যারাজ ভেঙে গেল।"

"সিনেমার গল্প?"

"না। এর মধ্যে সবটা গল্প নয়। সত্যিও আছে।"

কখন সন্ধে উতরে গেল। তারপর রাত।

এ এক অদ্ভুত অবস্থা চারপাশে। ঘন অন্ধকারে চারপাশ ডুবে আছে। নদী বয়ে চলেছে আপন মনে। তার তো দিনরাত্রি নেই, আলো-অন্ধকার নেই। গাছ, নদী, বন— যেন এইরকমই, তাদের দিন নেই রাত নেই।

আমরা পাথরের গায়ে মাথা হেলিয়ে বসে আছি। ঘুম পাচ্ছে— তবু ঘুমোতে পারছি না। এভাবে কী ঘুমনো যায়! কোথায় কখন সাপখোপ, বিষাক্ত পোকামাকড় বেরিয়ে পড়বে!

কুমারসাহেব টর্চ জ্বেলে-জ্বেলে চারপাশ একবার দেখে নিচ্ছিলেন। তাঁরও ঘুম এসে গিয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছিল সন্ধে থেকেই। এখন আরও ঠাণ্ডা। শীত করতে শুরু করেছিল।

আরও রাত বাড়ল।

আমরা হাই তুলতে শুরু করেছিলাম।

এমন সময় আচমকা যেন কুমারসাহেবের কানে গেল শব্দটা। তিনি চমকে উঠে পিঠ সোজা করলেন। কান পেতে থাকলেন কিছুক্ষণ।

"আনন্দ, কিরপা ? শুনতে পাচ্ছ?"

"একটা শব্দ !"

কত দূর থেকে শব্দটা ভেসে আসছিল। কান পেতে মন দিয়ে না শুনলে শোনা যায় না।

"সেই শব্দ ! চলো পাথরের ওপারে যাই।"

আমরা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। শব্দ স্পষ্ট হচ্ছে। হতে-হতে ঠিক ঝিঁঝির ডাকের মতন শব্দ।

অথচ অন্ধকার আকাশে কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু তারাভরা আকাশ।

"কুমারসাহেব সেই, জ্যোৎস্না কোথায় ?"

"ওয়েট। দেখো কী হয় !"

ক্যাম্পের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। অন্ধকারে সব ঢাকা। বোঝাই যায় না ওখানে কোনও ক্যাম্প আছে।

খানিকটা পরে আমরা একেবারে অবাক। হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম।

অন্ধকারের তলায় ক্রমশ একজায়গায় আলো দেখা দিল। কুয়াশাভরা জ্যোৎস্নার আলো যেমন হয়।

দেখতে-দেখতে আলো বাড়ল। জ্যোৎস্না যেন। কী একটা এগিয়ে আসছে। নদীর প্রায় ওপরেই। আলো আরও ছড়িয়ে পড়ল। শব্দ সেই ঝিঁঝির ডাকের মতন। ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেল জিনিসটা।

কুমারসাহেব আমাদের ডেকে নিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন।

দেখতে-দেখতে মনে হল, ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গিয়ে আলো আরও স্পষ্ট হল। অথচ ঝকঝকে নয়, শীতকালের জ্যোৎস্নার মতন।

হঠাৎ নজরে পড়ল, নৌকোর মতন বা ডোঙার মতন একটা জিনিস যেন কেউ আকাশ থেকে নামিয়ে দিল। সেটা ভাসতে লাগল।

কুমারসাহেব বললেন, "এয়ার ক্রাফ্‌ট। এরোপ্লেন।"

"কোনটা?"

"ওপরেরটা। ওটা এরোপ্লেন। কেরিয়ার প্লেন।"

"নিচেরটা?"

"বুঝতে পারছি না।"

"প্লেনের গায়ে আলো জ্বলছে। সারা গায়ে?"

"না, না। মনে হয় না।"

"তবে?"

"অন্য কোনও প্রসেস। বোধ হয় এমন কোনো ব্যবস্থা করা আছে যাতে প্লেনটার সারা গা দরকার মতন জ্বলজ্বল করে ওঠে।"

"ওই দেখুন!"

নৌকো বা ডোঙার মতন জিনিসটা এবার প্লেন থেকে আলাদা হয়ে গেল। হয়ে নিচে নামতে লাগল ভাসতে-ভাসতে।

কুমারসাহেব কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, "গ্লাইডার। ওটা গ্লাইডার।"

"সেটা কী, সার?"

"গত যুদ্ধের সময় এরকম গ্লাইডার চালু হয়েছিল। শত্রুপক্ষের সীমানার মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হত। ভেতরে সৈন্য থাকত। টাফ্ সোল্‌জার্‌স। তাদের সঙ্গে সমস্ত রকম আর্ম্‌স। যেখানে গিয়ে নামত গ্লাইডার সেখান থেকে লুকনো সৈন্যরা বেরিয়ে পড়ত। গ্লাইডার প্লেন নয়। চারপাশ ঢাকা মাকুর মতন। ওর নিজের কোনও মেশিনারি নেই, ওড়ার। ভাসতে ভাসতে নিচে মাটিতে নেমে আসে। পুরনোকালে তাই ছিল। এখনকার কথা বলতে পারব না।"

গ্লাইডার যদি হয়— তবে সেটা নেমে এল। মনে হলে ক্যাম্পের মাথায়। ক্যাম্পের মধ্যে নিচে যদি কোথাও চাপা আলোর ব্যবস্থা থাকে ল্যান্ডিংয়ের, জানি না। দেখতে পাচ্ছিলাম না।

দেখার মতন দৃশ্য।

আমরা অবাক হয়ে দেখছিলাম।

এমন সময় হঠাৎ যেন কী হল? গ্লাইডার নামতে-নামতে আচমকা নদীর ওপর চলে গেল।

তারপর দেখি, আলোর একরকম তীর যেন কেউ ছুড়ে দিচ্ছে গ্লাইডার থেকে।

কুমারসাহেব প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও, চিৎকার করে বললেন, "পালাও, পালাও। শেল্টার নাও। পাথরের আড়ালে। জলদি। হারি আপ!"

আমরা ছুটতে শুরু করলাম।

নদীর বালি, জল, গর্ত— কত জোরে দৌড়ব আর! তবু

প্রাণপণে দৌড় মারলাম।

কপাল ভাল, বড়-বড় পাথর জুটে গেল।

পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ফেললাম নিজেদের।

দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়! জিভ বেরিয়ে আসছে। হাঁপাতে লাগলাম।

কুমারসাহেব প্রায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আখলা বলল, সাহেবকে জল খাওয়াতে পারলে হত!

কিন্তু কোথায় জল? আমাদের জলের ফ্লাস্ক তো আগের পাথরগুলোর পাশে যেখানে বসে ছিলাম সেখানে পড়ে আছে। কে এখন ফ্লাস্ক আনতে যাবে!

তবু আখলা গেল। আমরা তাকে আরও একটু অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। শুনল না।

কুমারসাহেব শুয়ে থাকতে-থাকতে একটু স্বাভাবিক হলেন।

"আমরা সবাই সেফ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু ওটা কী? তীরের ফলার মতন আলোর ফলা!"

"ফ্লাশ। রে গান বলে মনে হয়। ম্যাগনেটিক রে গান। তোমার দাদা বোধ হয় ওই ফ্ল্যাশ হিটে মারা গেছেন।"

"কী সর্বনাশ! আখলা যে আপনার জন্যে জলের ফ্লাস্ক আনতে গেছে।"

"আখলা! ও মাই গড! তোমরা ওকে ছাড়লে কেন?"

"আমরা ছাড়িনি। নিজেই ও চলে গেল!"

"জল আনতে গেল! ফিরবে তো? হায় ভগবান!"

আখলা গেল তো গেল, আর ফিরছিল না।

কুমারসাহেবের গলা শুকিয়ে কাঠ হলেও ক্রমশ তিনি নিজেকে খানিকটা সামলে নিলেন। ছটফট করতে লাগলেন আখলার জন্য!

আমরা কী করব! আখলা কি আমাদের জিজ্ঞেস করে গিয়েছে? ও তো নিজেই ছুটে বেরিয়ে গেল। তবু নিজেদের কেমন অপরাধী মনে হচ্ছিল।

পাথরের আড়ালে আমরা বসে আছি। ওপাশে কী ঘটছে বোঝার উপায় নেই। গুলি-গোলার শব্দ থাকে বোঝা যায়, কিন্তু ওই বিচিত্র ফ্লাশগান— বা রে গান যে-নামই হোক বস্তুটার, তার কোনও শব্দ থাকে না। শুধু আলোর ফলা, কিংবা তীর। ব্যাপারটা বোঝানো মুশকিল। তবু বলি, এমন যদি হয়— আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক মারল তীব্রভাবে অথচ তারপর আর মেঘের ডাক শোনা গেল না— তা হলে যেমন হবে, এও অনেকটা সেইরকম। কোনও শব্দ নেই এই মারণ-অস্ত্রের, শুধু এক অতি-উজ্জ্বল নীলচে আলোর তীর ছুটে আসে।

কুমারসাহেব বললেন, "এখন আমি কী করি! আখলাবেটা ইডিয়েট ফুল্ বুদ্ধু একটা। এ-সময় কেউ বাইরে যায়! ওর যদি কিছু হয়— কী হবে!"

"দেখুন না আর-একটু।"

"ও মারা গেলেও আমরা এখান থেকে জানতে পারব না।"

"মারা যাওয়ার কথা আগে থেকে ভাবছেন কেন— !" আনন্দ বলল। কিন্তু আমরা কেউই জোর করে কি কিছু বলতে পারি!

সময় যে কেমন করে কাটছে— কত দীর্ঘ হয়ে— তা শুধু আমরাই অনুভব করতে পারছিলাম।

আখলার জন্য উদ্বেগ আর ভয় আমাদের কেমন পাগল করে তুলছিল।

এমন সময় গলা পাওয়া গেল আখলার।

আমরা চমকে উঠলাম।

"এদিকে! আখলা এদিকে।"

আখলা এল। জলও নিয়ে এসেছে।

বাঁচলাম আমরা।

কুমারসাহেব প্রথমে খানিকটা গালমন্দ করলেন আখলাকে। একেবারে দেহাতি ভাষায়, কেন সে জল আনতে গিয়েছিল। যদি মরত, কী হত!

আখলা গা করল না। গালমন্দগুলো যেন তার এ-কান দিয়ে ঢুকে ও-কান দিয়ে বেরিয়ে গেল।

জলটল খাওয়া হলে আমরা বুকভরে শ্বাস নিতে পারলাম।

শেষে কুমারসাহেব আখলাকেই বললেন, সে নদীতে কিছু দেখেছে?

আখলা বলল, "হ্যাঁ— দেখেছে।"

"কী দেখেছিস? ওই নৌকোটা?"

"জি।"

"এখনও আছে? কোথায় আছে ওটা?"

আখলা যা বলল, তাতে মনে হল গ্লাইডারটা জলে ভাসছে। তবে বিজলি মারছে না।

কুমারসাহেব বললেন, "আনন্দ! দিস ইজ ভেরি মিস্টিরিয়াস!

নদীমে ভাসছে, ব্যস ! মতলব ?"

আনন্দ মাথা নাড়ল। সে আর কী বলবে ?

কুমারসাহেব বললেন, "আমাদের পক্ষে এখন বাইরে বেরনোও রিস্কি। ওই গ্লাইডারটা কেন ওভাবে নদীর জলে ভাসছে কে জানে ! ওরা আমাদের ওয়াচ করছে কিনা তাও জানি না।"

"তা হলে কি সারারাত এভাবে লুকিয়ে থাকতে হবে ?"

"উপায় নেই।"

"কিন্তু সার, এভাবে না থেকে যদি আমরা গুহার কাছে যাই ?"

"কেমন করে ?"

"পাথরের আড়ালে-আড়ালে বুকে হেঁটে।"

আমি বললাম, "গুহার মধ্যে জল ! সারারাত জলের মধ্যে বসে থাকব ! অসম্ভব !"

কুমারসাহেবেরও মনে হল, গুহার জলের মধ্যে বসে না থেকে এই পাথরের আড়াল অনেক ভাল।

আমার মনে হল, চুলোয় যাক গ্লাইডার। এর চেয়ে অনেক ভাল যদি আমরা গুহার মধ্যে ফিরে যাই। বেশ, জলে না হয় না বসে থাকলাম। আমাদের সঙ্গে দু-তিনটে জোরালো টর্চ আছে। জল ঠেলে গুহার ওপারে গিয়ে পৌঁছতে পারলে আমরা নিরাপদ।

কুমারসাহেব ভেবেচিন্তে বললেন, "আরও খানিকটা দেখা যাক। আমি ওই ফ্লাশ হিটকে ভয় পাচ্ছি। ও তোমার রাইফেল মেশিনগানের গুলির চেয়েও ভয়ঙ্কর। তোমাকে সাবধান হওয়ার সুযোগ দেবে না।"

"তা মানলাম। কিন্তু আমরা ওদের টার্গেট কিনা তাও জানি না।"

"কেন ?"

"আমার মনে হল, ওখান থেকে এলোপাথাড়ি আলোর তীর

ছুটে আসছে। আর শুধু এপাশেই নয়, ওপাশেও। মানে নদীর দু'ধারেই আলোর তীর— বা ফ্ল্যাশ ছুটে গিয়েছে। কাজেই, আমরাই যে টার্গেট এমন মনে করার কারণ নেই।"

কুমারসাহেব মন দিয়ে শুনলেন আমার কথা। আসলে আমরা সবাই রহস্যময় দৃশ্যটি দেখার ঝোঁকে যখন তন্ময়, ঘোরের মধ্যে আছি— তার সামান্য পর-পরই ওই আলোর ঝিলিক ছুটে আসার মারাত্মক ঘটনাটি ঘটল—। তখন যে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ছুটছি। ভাল করে কিছু দেখার সময় কোথায় তখন! কে কী দেখেছি, বা দেখিনি— তা যেন এখন আর মনেই পড়ে না, তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে।

কুমারসাহেব তবু রাজি না। তিনি কারও প্রাণের ঝুঁকি নিতে রাজি নন। বললেন, "ওয়েট ফর অ্যানাদার ওয়ান আওয়ার। এখন তিনটে বাজে। চারটে নাগাদ খানিকটা ফরসা হবে। তখন—"

"তখন তো আমরা আরও ওপ্‌ন হয়ে যাব, সার। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে হেঁটে যেতে গেলেই ওরা দেখতে পাবে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমরাও ওই গ্লাইডারটাকে দেখতে পাব।"

"তাতে লাভ?"

"গ্লাইডারের মধ্যে যারা আছে তারা বেরিয়ে আসবে।"

"টাফ সোলজার্‌স! ওরে বাব্বা!"

"আর একটা ঘণ্টা কাটতে দাও। তারপর আমাদের ভাগ্য! আমি বড় ভুল করেছি, কির্‌পা! তোমাদের নিয়ে আসা উচিত হয়নি। আমারও আসা উচিত হয়নি। আমি ভাবতেও পারিনি এরকম হবে।"

কুমারসাহেবের দোষ নেই। আমরাও কি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম, একটা মাথা-ঢাকা ছোট নৌকো— তা গ্লাইডার হোক

বা যাই হোক এভাবে নদীতে এসে নামবে! না, নামার সময় আলোর তীব ছুড়বে?

যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এখন কোনওরকমে প্রাণটুকু নিয়ে পালাতে পারলেই বাঁচি!

সামান্য ফরসা ভাব হয়ে এল। ভোর নয়, আবার রাতও নয়। রাত কেটে খুব হালকা ফরসা ভাব হল।

কুমারসাহেব পাথরের আড়াল থেকে এগিয়ে সাবধানে মুখ বাড়ালেন। দাঁড়ালেন না। কোমর নিচু করে লুকিয়ে-লুকিয়ে বাইরেটা দেখতে লাগলেন।

বেশ খানিকক্ষণ নজর কারার পর আমাদের ডাকলেন।

"দেখছ?"

দেখতে পাচ্ছিলাম। যদিও স্পষ্টভাবে নয়। খুবই আশ্চর্যের কথা, ওই দূরে যেটা ভাসছে নদীর বুকে, তার বাইরে কোনও আলোর চকচকে ভাব নেই। গতকাল ছিল। এখন ওটাকে সাধারণ অ্যালুমিনিয়ামের মতন রঙের দেখাচ্ছে।

আনন্দ বলল, "কুমারসাহেব, এ কী! সেই ব্রাইটনেস কোথায় গেল?"

"তাই ভাবছি।"

"কোনও লোকও তো দেখছি না!"

"না।"

"ওটা প্রায় ক্যাম্পের কাছে। শ'দুই-তিন গজ দূরে!"

আমরা বেশিক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়ালাম না। "গুহার দিকে হেঁটে চললাম। আরও খানিকটা ফরসা হয়ে এল।

গুহার কাছে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকলাম দূরে। এই জায়গাটা অনেক নিরাপদ।

"সার!"

"বলো !"

"তা হলে এবার গুডবাই করে যাওয়া যেতে পারে।"

"চলো।... আমি অবাক হয়ে ভাবছি, গ্লাইডারটা এমন ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেল কেমন করে ? ওর ওপরে যে লুমিনাস ভাব ছিল— কোথায় গেল ! দুটো জিনিস হতে পারে। এক, ভেতর থেকে সুইচ অফ করে বাইরের আলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

"কেন ?"

"শত্রুপক্ষের এলাকার আশেপাশে গিয়ে যখন গ্লাইডারটা নামে— তখন যাতে চট করে চোখে না পড়ে— এটা একটা কারণ হতে পারে। ঝকঝক করলে সহজেই চোখে পড়ে যাবে। হয়তো তাই কোনও সিস্টেম আছে, যাতে মাটিতে নামার পর সুইচ অফ হয়ে যায়।"

"অটোমেটিক ?"

"হতে পারে !"

"আর-একটা কারণ কী হতে পারে ?"

"ওই গ্লাইডারের কোনও মেকানিকাল ফল্ট হয়েছে।"

"তাই কি নদীতে পড়েছে ?"

"এভরি চান্স।"

আমি বললাম, "ওর মধ্যে যারা ছিল !"

"বলতে পারি না।"

আমরা আর দাঁড়ালাম না।

খানিকটা জল ঠেলে গুহার পথ দিয়ে এপাশে এলাম।

সকাল হয়েছে।

এপাশে এসে মনে হল, এ অন্য জগৎ। ফরসা হয়েছে চারপাশ। আলো ফুটেছে। সূর্যও উঠে এল প্রায়। গাছপালা, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। গতকালের ব্যাপারটা যেন এক

দুঃস্বপ্ন !

আমাদের ট্রেকার গাড়ি খানিকটা আড়ালে রাখা ছিল ।

গাড়ির কাছাকাছি যেতেই চমকে উঠলাম ।

সান্যালসাহেব, তাঁর দুই গার্ড, আর একটা জিপ ।

আমরা এত চমকে গিয়েছিলাম যে, বিশ্বাসই হচ্ছিল না এ-সময় সান্যালসাহেব এখানে হাজির থাকতে পারেন ।

"আপনি এখানে ?"

সান্যালসাহেব আমাদের দেখলেন। তারপর বললেন, "আপনাদেরও কি এখানে থাকার কথা ?"

"না।"

"তবে কেন এসেছেন ? ছেড়ে দেওয়ার সময় আপনাদের বারবার বলা হয়েছিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই এরিয়া ছেড়ে চলে যাবেন।"

কুমারসাহেব বিনয় করে বললেন, "চলেই যাচ্ছিলাম ।"

"যাননি কেন ?"

"প্লিজ, আমরা..."

"আপনারা বেশি চালাক, না, বুদ্ধিমান ?"

"ভুল হয়ে গেছে। এবার সত্যিই চলে যাচ্ছি।"

"যদি বলি, আর যাওয়া হবে না !"

"কেন ?"

"আপনাদের আমরা ধরে নিয়ে যাব।"

আমরা আঁতকে উঠলাম। "কোথায় ? আবার সেই ক্যাম্পে ?"

"হ্যাঁ। এখন ক্যাম্পে। তারপর এমন জায়গায়, যেখান থেকে সহজে বেরোতে পারবেন না। ট্রায়ালে দাঁড়াতে হবে।"

কুমারসাহেবও ঘাবড়ে গেলেন। মিনতি করে বললেন, "না,

না, সান্যাল ; প্লিজ ! আমরা এবার সত্যি চলে যাচ্ছি। আমাদের বড় ভুল হয়েছিল। মাফি চাইছি, প্লিজ !"

সান্যালসাহেব বললেন, "আপনারা যত চালাক, আমরা তার চেয়েও বেশি ওয়াচফুল।"

"সান্যাল," কুমারসাহেব বললেন, "আপনি আমাকে কিছু দেখাবেন বলেছিলেন। আমায় ক্যাম্পে দু-একদিন থাকতেও বলেছিলেন। এই দুই ইয়াং ফ্রেন্ডের জন্য আমি থাকতে পারিনি। ...না, আমাদের দোষ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু আপনি আমায় যে-কথা দিয়েছিলেন তার..."

"চলুন।"

"কোথায় ?"

"ক্যাম্পে !"

"সান্যাল, প্লিজ !"

সান্যালসাহেব এবার যেন একটু সদয় হলেন, বললেন, "আমার ওপর হুকুম আছে, আপনাদের কোনও রেল স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিতে।"

আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম যেন।

"আপনারা আমার জিপে আসুন। আমার গার্ড আর আপনাদের ড্রাইভার ট্রেকারে যাক। আসুন।"

সান্যাল নিজে ড্রাইভারের সিটে বসলেন। তিনিই জিপ চালাবেন। কুমারসাহেব বসলেন সান্যালের পাশে। আমরা

গাড়ির পেছন দিকে। অবশ্য যতটা পারা যায় সান্যালসাহেবের পিঠ-ঘেঁষে। গাড়ি খানিকটা এগুতে না এগুতে এক মজা হল। কুমারসাহেব হোহো করে হেসে উঠলেন হঠাৎ। হাসতে-হাসতে বললেন, "সান্যাল, আমি বুঝতে পেরেছি।"

"কী বুঝেছেন?"

"আমাদের পেছনে আপনাদের লোক ছিল। ওয়াচ করছিল। নয়তো আপনারা কেমন করে জানবেন আমরা কোথায়? মনোহর নিশ্চয় আপনাদের বলেনি।"

সান্যাল বললেন, "বলাবার কায়দা আমরা জানি। মনোহর জানে রাইফেলের কিংবা পিস্তলের একটা গুলি হেলাফেলা করার ব্যাপার নয়। তবে আপনি ওঁকে দোষ দিচ্ছেন কেন। বাস-অফিসে আপনি একটা ড্রয়িং ফেলে এসেছিলেন। অফিসে ঝোলানো ম্যাপ দেখে-দেখে এখানে আসার একটা নিশানা তৈরি করে নিয়েছিলেন মিস্টার কুমার। কাঁচা ড্রয়িং সেই কাগজটা বাস-অফিসেই পড়ে ছিল। তারপর মনোহরবাবুকে দুটো ধমক দিতেই—।"

কুমারসাহেব হতভম্ব! সত্যি তো, কাগজে আঁকা সেই ড্রয়িংটা তো তিনি ফেলেই এসেছিলেন। তাঁর মনেও হয়নি— এটা জরুরি। যা জানার ভাল করে বোঝার পর কে আর কাগজটার কথা ভাবে!

কুমারসাহেব ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দেখলেন একবার। "মিস্টেক হয়ে গেছে, কিরপা। ব্লান্ডার।"

আমরা আর কী বলব! কথায় বলে, চালাকেরও বাবা আছে। আমরা হলাম অ্যামেচার, আর সান্যালসাহেবরা হলেন পেশাদার। ওঁদের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়।

কুমারসাহেব নিজেকে সামলে নিয়ে হাসিমুখেই বললেন,

"সান্যাল, বোকাদের সাত খুন মাপ। আমরা খুবই দুঃখিত।"

"হুঁ!"

"তা এবার আসল কথাটা বলুন না? আমরা যা দেখলাম— এর রহস্যটা কী?"

"বলা যাবে না।"

"প্লিজ!"

"এগুলো গোপন রাখাই আমাদের কাজ। কাউকে বলতে পারি না।"

"তা হলে আমি আমার ধারণার কথা বলি?"

"আপনার কথা আপনি বলতে পারেন। সে অধিকার আপনার— আপনাদের আছে। আমি আপনাদের কথা শুনতে পারি।"

কুমারসাহেব পাইপ ধরাতে গিয়ে দেখলেন তামাক নেই। ফুরিয়ে গিয়েছে। বিরক্ত হলেন। "একটা সিগারেট খাওয়াবেন সান্যাল?"

"পকেটে আছে; নিতে পারেন। তবে খুব সাবধান। এই পকেটেই আমার রিভলভার আছে, সার্ভিস রিভলবার......"

কুমারসাহেব থতমত খেয়ে বললেন, "তবে থাক।"

সান্যাল নিজেই এবার হেসে উঠলেন।

জিপ দাঁড় করালেন সান্যাল। পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে আমাদের সিগারেট দিলেন। সিগারেট কেসটা কেমন যেন। ভেতরে একটা ঘড়ির মতন কী আছে। গোল, দাগ কাটা-কাটা। কেসের ওপরের দিকে লাগানো।

লাইটারও জ্বালিয়ে দিলেন সান্যাল।

তারপর নিজেই হেসে-হেসে বললেন, "মিস্টার কুমার, বী কেয়ারফুল। আপনি, আপনারা যা বলবেন, বা আমি বলব, সবই

এই খুদে যন্ত্রটুকু দিয়ে জিপের মধ্যে লুকনো রেকর্ডারে টেপ্‌ হয়ে যাবে।"

আমরা চমকে উঠলাম।

সান্যাল হাসতে লাগলেন। "বলুন মিস্টার কুমার— কী বলতে চান?"

কুমারসাহেব বার কয়েক ঢোঁক গিলে বললেন, "ওটা অফ করা যায় না? আই মিন্‌— এ তো আপনার সঙ্গে আমাদের পার্সোন্যাল কথা।"

"অফ করতে বলছেন? বেশ, করে দিচ্ছি।" সান্যাল যে কী

কর্ম করলেন, কে জানে ! পরে বললেন, "বলুন !"

গলা পরিষ্কার করে কুমারসাহেব বললেন, "আমরা যা দেখেছি— সেটা একটা প্লেন। স্পেশ্যালি ডিজাইন্‌ড। ওটার গায়ে কী আছে আমি জানি না। যে-কোনও সময়ে প্লেনটাকে ব্রাইট করা যায়, মানে ইলিউমিনেট করা যায়। প্লেনের বাইরেটা একেবারে ঝকমক করে উঠবে। জ্যোৎস্নার আলোর মতন। মুন্‌লাইট। বাট মিস্টি। সামথিং লাইক মিস্ট মেশানো আছে যেন। সান্যাল— আই, থিংক, দেওয়ালিতে বাচ্চারা ইলেকট্রিক তার— ম্যাগনেশিয়াম ওয়্যার পোড়ালে যেমন আলো হয় রঙের— অল মোস্ট দ্যাট কাইন্ড অব লাইট। অ্যাম আই রাইট, সার ?"

"মোটামুটি।"

"তবে আলো ব্রাইট হলেও তার চাপা ভাব আছে।"

আনন্দ হঠাৎ বলল, "সান্যালসাহেব, আমার মনে হয়, প্লেনটা সবসময় ওই আলো গায়ে জ্বালিয়ে যায় না। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে আসে। যখন তার ডেসটিনেশান বা স্পটে পৌঁছে যায় তখন আলো জ্বালিয়ে দেয়। কারেক্ট, সার ?"

"বলে যান...."

এবার কুমারসাহেব বললেন, "নিজের জায়গায়— স্পটে পৌঁছবার পর বারকয়েক চক্কর মারে। তারপর একটা গ্লাইডার নামিয়ে দেয়।"

"গ্লাইডার আপনি দেখেছেন ?"

"ছবিতে দেখেছি। লাস্ট ওয়ারের সময়, পরে অনেক ইংরেজি সিনেমা আসত এদেশে যুদ্ধের। সেই সিনেমায় দেখেছি।"

"কী দেখেছেন ?"

"দেখেছি, শত্রুপক্ষের অক্যুপায়েড জোনে, নির্জন জায়গা বুঝে গ্লাইডারগুলোকে ফেলে দেওয়া হত। তার মধ্যে থাকত

সোলজার্স, দশ-পনেরোজন। ভেরি টাফ। গ্লাইডার যেখানে নেমে পড়ল, সেখান থেকে সোলজারগুলো বেরিয়ে এসে খুঁজে-খুঁজে পজিশন নিত। ধরা পড়লেই শেষ।"

সান্যালসাহেব বললেন, "তাতে অনেক রিস্ক ছিল। গ্লাইডার অনেক সময় বনে-জঙ্গলে-নদীতে গিয়ে পড়ত। মানুষজনের মধ্যে। মারা গিয়েছে অনেকে। ধরা পড়ে বন্দি হয়েছে।"

"ওই নৌকো বা মাকুর মতন জিনিসটা গ্লাইডার। ঠিক কিনা বলুন?"

সান্যাল কোনও কথা বললেন না।

আমি বললাম, "আপনাদের এখানে ওই গ্লাইডার নামানো নিয়ে কোনওরকম এক্সপেরিমেন্ট হত।"

সান্যালসাহেব বললেন, "গত পঞ্চাশ বছরে অনেক জিনিসই পালটে গিয়েছে। যেগুলো সাধারণ জিনিস ছিল তখন— এখন সেগুলো আরও জটিল হয়েছে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও তা দেখতে পান। পান না?

"পাই।"

"মিলিটারিতে কতরকম নতুন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, রকেট, মিসাইল এসে গিয়েছে জানেন?"

"না।"

"আপনাদের জানার দরকার নেই।"

সান্যালসাহেব দিব্যি জিপ চালাচ্ছিলেন। পাকা হাত। আমাদের সামনে কুমারসাহেবের ট্রেকার। হাত দশেক দূরে। আমরা গার্ড দুটোকে দেখতেও পাচ্ছিলাম।

কুমারসাহেব বললেন, "সান্যাল, কালকের ব্যাপারটা কিন্তু বুঝলাম না।"

"কী ব্যাপার?"

"গ্লাইডার নদীতে পড়ল কেন ? ওটা তো আপনাদের ক্যাম্পে নামার কথা। টার্গেট মিস করেছিল ?"

"না।"

"তবে ?"

"কাল একটা মহড়া ছিল।"

"মহড়া ?.... মানে কী বলে যেন— ! এক্সারসাইজ !"

"হ্যাঁ। নদীতে নামারই কথা ছিল। ওটা একরকম ডামি।"

"ডামি ? নকল ?"

"কুমারসাহেব, আপনি বহুত কিছু জানেন। এটা বোধ হয় জানেন না। গত ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় আকাশ থেকে— মানে প্লেন থেকে ডামি প্যারাট্রুপার্স নামানো হয়েছিল ঝাঁকে-ঝাঁকে, শত্রুপক্ষকে ভাঁওতা দিয়ে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে।... কালকের ওটাও এক জাতের ডামি গ্লাইডার। ওর মধ্যে কোনও লোক ছিল না।"

"লোক ছিল না ! আশ্চর্য ! তা হলে ওই যে আলোর তীরের মতন—"

"অটোমেটিক।"

"অটোমেটিক ?"

"হ্যাঁ। গ্রাউন্ড লেভেল থেকে পনেরো-বিশ ফুট উঁচুতে থাকতেই অটোমেটিক ফায়ারিং হবে।"

"এরকম ব্যবস্থা করার কারণ ?"

"আমাদের একটি লোকও মরবে না। ধরাও পড়বে না। লোক না থাকলে— শত্রুপক্ষের সীমানায় যেখানেই পড়ুক, ভয়টা কিসের ! সোজা কথায়, যে-ক্ষতি আমরা করতে চাই শত্রুপক্ষের সেটা ঠিকই হবে, অথচ আমাদের কোনও ক্ষতি হবে না।"

আমরা বুঝি না-বুঝি চুপ করে থাকলাম।

অনেকক্ষণ পরে সান্যালসাহেব বললেন, "তা হলে তো বলতে হবে এলোপাতাড়ি ফায়ারিং হল ?"

"এমনিতেও তাই হয়। স্টেনগান, মেশিনগান থেকে যখন গুলি চালানো হয়— তখন টার্গেট দেখে-দেখে গুলি চালাতে আপনি কমই দেখবেন। মিলিটারিতে একটা কথা আছে, কোন ঝোপে মুরগি লুকিয়ে আছে খুঁজতে যেয়ো না, শুট ; মুরগি থাকলে হয় মরবে না হয় ভয়ে উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।"

"ও ! আচ্ছা !"

সান্যালসাহেব বাঁকা পথ ধরলেন। আমরা ভাল রাস্তায় এসে পড়লাম।

কুমারসাহেব চারপাশ দেখতে-দেখতে বললেন, "ওই যে আলোর তীরের মতন জিনিসগুলো, ওগুলো কী, সার ?"

"ফ্ল্যাশ হিট। চলতি কথায় তাই বলে।"

"ওগুলো খুব মারাত্মক।"

"হ্যাঁ। গুলি খেয়েও লোকে বেঁচে যায়, ফ্ল্যাশ হিটে সারভাইভ করার কোনও সুযোগ নেই।"

আনন্দ বলল, "কৃপার বড়দা তবে ওতেই মারা গিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"টাওয়ার গার্ডদের গুলিতে নয় ?"

"না।"

"কিন্তু আপনি প্রথমে গুলির কথা বলেছিলেন।"

"আমাকে বলতে হয়। অফিশিয়ালি আমরা অন্য কিছু বলতে পারি না।"

"কেন ?"

"দিস ইজ অল সিক্রেট। খাতায়পত্রে কোনও রেকর্ড রাখার নিয়ম নেই।"

"আপনাদের এই ক্যাম্প কি মিলিটারির আওতায় ?"

"সরাসরি নয়। আমরা গত তিন বছর এখানে একটা প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ করছিলাম। সেটা এখন শেষ হয়েছে। ওই ক্যাম্প ভেঙে ফেলা হবে। আমরা কেউ থাকব না। ক্যাম্পের কোনও চিহ্নও থাকবে না। একেবারে মিশিয়ে দেওয়া হবে মাটির সঙ্গে। তিন-চার মাস পরে যদি আপনারা আসেন এখানে, ক্যাম্পের কিছুই পাবেন না, ভাঙা ইট-পাথর ছাড়া....।"

কুমারসাহেব বললেন, "তার মানে মন্দারগড়ের রহস্য আর থাকবে না ?"

"না। আমরা পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাব।"

আমরা সবাই চুপ। বন-জঙ্গল পার হয়েছি আগেই, পিচের রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম। দু'পাশে অজস্র গাছ। মাঠ। লোকালয় তেমন চোখে পড়ছে না। একটা বাস আসছিল। আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল সামান্য পরে।

কুমারসাহেব হঠাৎ বললেন, "সান্যাল, আপনি কিছু বলবেন না বলেছিলেন, অথচ পরে অনেক কথা বলে ফেললেন।"

"আপনাদের কৌতূহল মিটিয়ে দিলাম। কিন্তু আমি যা বলেছি তা শুধু আপনারা কানেই শুনলেন। এর কোনও প্রমাণ দিতে পারবেন না। এটা গল্প হয়েই থাকবে, ফ্যাক্ট হিসেবে থাকবে না।" সান্যালসাহেব হাসলেন। পরে বললেন, "আপনারা ভাগ্যবান। কাল যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটত, কেউ আপনাদের বাঁচাতে পারত না।..... যাক, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।"

প্রায় আধ ঘণ্টার ওপর জিপ চালিয়ে এসে সান্যালসাহেব একটা রেল স্টেশনে এলেন।

গাড়ি দাঁড়াল।

আমরা নামলাম।

সান্যালসাহেব বললেন, "আপনাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে আমার ছুটি।"

কুমারসাহেব বললেন, "আমার ট্রেকার?"

"আপাতত ওটা আমরা মনোহরবাবুর জিম্মায় রেখে চলে যাব। পরে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন। এখন নয়। সোজা ট্রেনে উঠে পড়বেন আপনারা। ভাববেন না। আপনাদের মালপত্র আমার লোক ট্রেনে তুলে দেবে অবশ্য।"

গাড়ি এল ঘণ্টা-দেড়েক পরে।

সান্যালসাহেব আমাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। "গুড বাই। আপনাদের কাছে টিকিট নেই, না? টাকা আছে?"

"আছে।"

"আমার লোক গার্ডসাহেবকে বলে দিচ্ছে। পরে যে যার টিকিট করে নেবেন। গুড বাই।"

আমাদের বিদায় জানিয়ে সান্যালসাহেব চলে গেলেন।

ট্রেনও ছেড়ে দিল সামান্য পরে।